মনোজ বসু

চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬২
প্রথম সংস্করণ--আশ্বিন, ১৩৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭
তৃতীয় সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৯
প্রকাশক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা চার আনা

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সুহৃদ্বরেষু

এই বই সম্বন্ধে—

যুগান্তর—'জাতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের গৌরবময় পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মধুক্ষরা লেখনীর মুখে নীলবিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগস্ট-বিপ্লবের অশ্রুসিক্ত অধ্যায়গুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।… মর্মচেরা আত্মদানের বিস্মৃত-প্রায় বিচিত্র কাহিনী, সংগ্রাম ও সংগঠনের ভুলে-যাওয়া ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতোই একে একে ছায়া ফেলিয়া যায় মনে। ইতিহাসের সেই ঝরাপাতা কুড়াইয়া সাহিত্যের রসে ভিজাইয়া লেখক জাতির জীবন-প্রবাহকে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন।' দুই টাকা চার আনা।

হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড—'The novel unfolds the epic story of India's struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country...what Monoj Babu has given us, of course, is a work of fiction—the literary excellence of which is of a high order. But when history fails, fiction has to step in to bridge the gulf. Episodes which are apparently unconnected have been welded into an integrated whole with masterly skill and the resultant gripping narrative is a brilliant first-rate novel. The author of BHULI NAI to use a cliches has added one more feather to his cap.'

ডুম-ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোল বাজাচ্ছে প্রফুল্লর লোক। জানিয়ে দিচ্ছে, ইতিহাসে জ্বল-জ্বল করবে আজকার তারিখ—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। কত সংগ্রামের পর এই দিনে পৌঁছলাম! পথের শেষে নয়—নূতন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আরও দুস্তর পথে যাত্রা।

উৎসব-সভায় লোক হচ্ছে না? হবে, হবে বই কি! কত কষ্ট করে শহর থেকে তোমরা এসেছ, লোক না হলে ছাড়বে প্রফুল্ল? ব্যস্ত হোয়ো না, অনেক দেরি এখনো। ইস্কুলের মাঠে পাকুড়-তলায় সভার জায়গা। হায়-রে, পোড়া ইস্কুল-ঘরে আবার লোক গিসগিস করছে! তোমাদের মতো নামজাদা মানুষরাও থাকবে তার মধ্যে। চল, এগুনো যাক পায়ে পায়ে।

মেলা দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন শহরে। এই যে স্বাধীন হয়েছি, এর পূর্বাপর ইতিহাস ছবি দিয়ে গেঁথে রেখেছিল মেলার এক ঘরের মধ্যে। তুমি লেখক মানুষ নিশিকান্ত—ভেবে চিন্তে দেখো তো আমাদের জয়রামপুর নিয়ে কিছু লেখা চলে কি না। কত মিথ্যে কথাই রসিয়ে রাঙিয়ে লিখে থাক, এখানকার সত্যি মানুষদের নিয়ে লেখ না একবার। তোমার কলমের জোরে তারা বেঁচে উঠুক স্বাধীন ভাগ্যবান দেশবাসীর মনে।

মস্ত বড় গ্রাম আমাদের। নূতন মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। শুনছি শিগগিরই কৃষ্ণপক্ষে কয়েকটা রাস্তার মোড়ে কেরোসিনের আলো জ্বলবে। ছ'টা বড় বড় পাড়া। দস্তুরমতো কৌলীন্য আছে এই জয়রামপুরের—সাহেব-ঘেঁসা আমরা চিরকাল। সাদা সাহেবের এ অঞ্চলে যাতায়াত সুদূর অতীত-কাল থেকে। একটা পাড়ার নামই আছে সাহেব-পাড়া। বাঁশবনটা ছাড়িয়ে

পড়ব সেখানে। পাকা রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে। সাহেবরাই নিজেদের গরজে তৈরি করেছিল এ রাস্তা। এখন আরও কয়েকটা হয়েছে, কিন্তু এইটে আদিতম। এই সেদিন অবধি বাঘে-গরুতে জল খেত সাহেবদের প্রতাপে। বড় বড় বাংলো তৈরি করে রাজার হালে তারা থাকত। আজকে শামুক-ভাঙা কেউটের আস্তানা সে জায়গায়।

বহু-বিস্তৃত বাঁশবন। ঝাড়ের যেন অন্ত নেই, মাইলখানেক জায়গা জুড়ে আছে। একটা দিনের কথা বলি, বারো-তেরো বছর বয়স হবে আমার। ঘোর হয়ে গেছে, গরু আসে নি গোয়ালে। দুধাল গরু—ঠাকুরমা ঘর-বা'র করছেন। তখন বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই গরু খুঁজে আনবার মতো। আমি বললাম, ব্যস্ত হোয়ো না ঠাকুরমা, প্রফুল্লদের গরুর সঙ্গে চরতে দেখেছি, তাদের খামার-বাড়ি হয়তো ঢুকে পড়েছে। দেখে আসি।

ঐ যে ডান দিকে ফাঁকা জায়গাটা নিশিকান্ত, ক'টা ছেলে হুন-দাড়ি খেলা করছে—ঐখানে ছিল প্রফুল্লদের খামার-বাড়ি। এখন প্রফুল্ল ন্যাপলার মা'র বাড়ির আমবাগান কাটিয়ে বিশাল অট্টালিকা তুলেছে। পথের ধারেই পড়বে, দেখাব তোমায়।

ভর সন্ধেবেলা গরুর খোঁজে দুটো পাড়া অতিক্রম করে এই এত দূর এলাম। এসে শুনি—শুঁটকি আমাদের সত্যিই খামারে ঢুকে পোয়াল-গাদা থেকে পোয়াল টেনে টেনে খাচ্ছিল, ওরা দেখতে পেয়ে বেহদ্দ পিটুনি দিয়ে দিয়েছে। তারপর বাঁশতলার এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি, মনে হল—ঐ তো সাদা মতো·· শুঁটকিই। বড্ড রাগ হল, শিঙে একবার দড়ি পরাতে পারলে হয়। ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান হচ্ছি, আর হতভাগা গরু শুয়ে পড়ে দিব্যি জাবর কাটছে ওখানে।

জায়গাটায় এসে দেখি, কিছু নয়—ঝাড়ের ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে, সেইটে

গরুর মতো মনে হচ্ছে দূর থেকে। ডাকছি, শুঁটকি-ই-ই! সামনের দিকে কি-একটা নড়ে উঠল—শুঁটকি না হয়ে যায় না···ছায়া দেখে দেখে এমনি অনেকটা এগিয়ে গেছি নিশিকান্ত, হঠাৎ জোরে বাতাস এল, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল বাঁশঝাড়ে। সর্বাঙ্গ শির-শির করে উঠল। ছেলেমানুষ পেয়ে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অশরীরী বহুজন, চেপে ধরবে বুঝি বাঁশের আগা দিয়ে। রাস্তার দিকে দৌড় দিই। ঝাড়ে ঝাড়ে যেন ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে, বাঁশ নুয়ে নুয়ে পড়ছে আমার পথ আটকে—এই একবার মাটি ছোঁবার উপক্রম, পরক্ষণে আবার সটান উপরে উঠে যাচ্ছে। চাবুকের মতো সপাৎ করে কঞ্চির বাড়ি লাগল মুখের উপর। বাঁশপাতা ঝরছে, মুঠো মুঠো বাঁশপাতা যেন আমার গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় পড়েও ছুটছি। বাঁশবনের আওয়াজ কানে আসে। এক ঠাকুর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের গল্প শুনেছিলাম, তারাই শাসাচ্ছে যেন আমায়। ঠাকুরমাকে দেখতে পেয়ে সুস্থির হলাম, লণ্ঠন নিয়ে আমার খোঁজে আসছিলেন। বললেন, শুঁটকি এসে গেছে রে। হুড়কোর ধারে এসে শিং নাড়ছিল, তাকে গোয়ালে তুলে তোকে ডাকতে বেরিয়েছি।

রাতে শুয়ে পড়ে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রামজয় ঠাকুরকে দেখেছ তুমি—সেই যিনি বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন?

কিন্তু ঠাকুরমা কেন—তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ শশিকান্ত নাকি হামাগুড়ি দিতেন সেই সময়। অথচ গল্পটা ঠাকুরমা এমন গড়-গড় করে বলে যান, যেন আগাগোড়া চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন তিনি।

নিশিকান্ত, যাবে নাকি বাঁশবনের ভিতর খানিকটা এগিয়ে, রামজয় ঠাকুরের আসন দেখতে? এই সুঁড়িপথের ছায়ায় ছায়ায় স্বচ্ছন্দে নদীর

ধারে হাটখোলা অবধি চলে যেত পার। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এই দিক দিয়ে, পথ অনেক কম—কিন্তু গ্রামের মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঁশবনে ঢোকে না। রাত-বিরেতে সহজে মাড়াতে চায় না এদিককার পথ।

পঞ্চবটীতলা—এখন একটা নিমগাছ মাত্র। ভারি জাগ্রত স্থান ছিল এটা, দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসত। দেখ, বাঁশঝাড় চারিদিকে চেপে ধরেছে নিমগাছটাকে—আসল গাছ অনেকদিন মরে গেছে, খান দুই ডাল বেঁচে রয়েছে কোনপ্রকারে, আর ক-বছর পরে চিহ্ন থাকবে না এ গাছের। ঠাকুরমার গল্পে শুনেছি, রামজয় ঠাকুর স্নান-আহ্নিক সেরে দেড়প্রহর রাত্রে এই গাছতলায় এসে বসতেন, শিষ্য-সেবকেরা সেই সময় চারিদিকে ঘিরে এসে বসত।

কোম্পানির তখন প্রথম আমল। ঠাকুর তো আস্তানা গেড়ে নিশ্চিন্ত আছেন। বাঁশবাগান নয় এটা তখন, ভদ্রার প্রান্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ মাঠ। দো-চালা খোড়ো-ঘর বেঁধে সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হল সকলের আগে। তার চারিদিকে সংখ্যাতীত কুঁড়ে উঠল আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগত সাধুসজ্জনের থাকবার জন্য। মাঠের মাঝখানে গ্রাম গড়ে উঠল দেখতে দেখতে। তালুকদার এল একটা নিরিখ সাব্যস্ত করে বন্দোবস্ত দিতে, পঞ্চায়েত-চৌকিদার ট্যাক্সর তাগাদায় এল। ঠাকুর বলে দিলেন, রাজার প্রজা নই, সাধুরও খাতক নই। দেবীর কিঙ্কর—খসে পড় বাপধনেরা।

গ্রাম আরও জেঁকে উঠছে, নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। ঢেঁকি-ঢেঁকিশাল তাঁত-চরকা হাপর-নেহাই—যা কিছু মানুষের দরকারে পড়ে। জয়রামপুরের বিলের মধ্যে বিস্তীর্ণ ধানবনের বেশির ভাগই সে আমলে কারকিত করত ঠাকুরের লোকজন। এক খোলাটে ধান এনে তুলত, ঝেড়ে উড়িয়ে তুলে দিত ধর্মগোলায়। ট্যাক্স-খাজনার ধার ধারত না, দিব্যি ছিল।

আগরহাটি সবে তখন চৌকি বসেছে। সে এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূর, দুর্গম পথ-ঘাট। এক বিকালে ঘোড়ায় চেপে দারোগা এল। পাকা রাস্তা না হওয়া অবধি ও-অঞ্চল থেকে আসা-যাওয়া বড় কষ্টকর ছিল। রাত থাকতে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, তা-ও প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল পৌঁছতে। গাঙে-খালে তিনটে পারাপার—ঘাটে এসে হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হয়। মানুষ পার হলেও ঘোড়া পার করে আনা বেশি মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারোগা এসে গড় হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। ঠাকুর পূজার নির্মাল্য জবাফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাথরের বাটিতে ঘোল আর রেকাবিতে করে খান কয়েক বাতাসা দিয়ে গেল একজন। খেয়ে দারোগা ঠাণ্ডা হল। তারপর বলে, ট্যাক্স চাইতে এসেছিল—হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানির রাজ্য জানেন এটা?

না বাবা, সর্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরীর রাজ্য। কারো তিনি ইজারা দিয়ে দেন নি পৃথিবীর জায়গা-জমি। বাজে কথা রাখ, অতিথ এসেছ—খাও-দাও থাক দু-চার দিন—মায়ের নাম কর, আরাম পাবে। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখি নে, কারো সঙ্গে গোলমাল করতে যাই নে। আমাদের কেন এসে জ্বালাতন করছ বাবা?

দারোগা দিন পাঁচ-ছয় রইল সেখানে। ঠাকুরমা বলেন, চর্বচোষ্য খেয়ে দিব্যি মজায় ছিল। গিয়ে কিন্তু সদরে রিপোর্ট পাঠাল, জবরদস্তি করে আটকে রেখেছিল তাকে। গ্রামে এ দিকে সোরগোল পড়েছে, চওড়া পরিখা কাটা হচ্ছে চারিদিক ঘিরে। আস্ত বাঁশ পুঁতে পুঁতে প্রাচীর তৈরী হল—পর পর তিনটে প্রাচীর—দস্তুরমতো এক কেল্লা। আর ওদিকে অনিবার্য ভাবে যা ঘটবার কথা—এক দল গোরা সৈন্য এসে পড়ল।

লম্বা চওড়া ইয়া দশাসই জোয়ান, রক্তাম্বর-পরা—এই নাকি ছিল ঠাকুরের

চেহারা। বুক ফুলিয়ে খালি গায়ে সৈন্যদের বন্দুকের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তারা অবাক হল। ঠাকুর বলেন, কেন গণ্ডগোল করতে এসেছিস? ঘরের ছেলেরা ঘরে চলে যা। আমরা তো বাছা থুতু ফেলতেও যাই নে তোদের দেশে-ঘরে।

কিন্তু ফিরে যেতে আসে নি তারা। বন্দুক ছোঁড়ে—ফাঁকা আওয়াজ, ভয় দেখাবার জন্য। ফলে উল্টা-উৎপত্তি হল। প্রথমটা সকলের ভয় হয়েছিল—ভেবেছিল, ঠাকুর মরে পড়ে আছেন বুঝি নূতন-কাটা পরিখার ভিতর। কিন্তু হাসতে হাসতে ঠাকুর কেল্লায় এসে ঢুকলেন। লোহার গুলি তাঁর গায়ে লেগে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। হবে না কেন—ধর্ম সহায়, কারও উপর অন্যায় করতে যান না তো তাঁরা—নিজের জায়গায় চুপচাপ নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

বাঁশের কেল্লা দেখে খুব হাসছে গোরা-সৈন্যরা। এগিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করে তারা প্রাচীরের খান কয়েক বাঁশ খুলে ফেলল। সেই সময় এক কাণ্ড—পাকা মন্দির হবে, তার জন্য পাঁজা ভেঙে ইট স্তূপীকৃত করে রেখেছে, ঠাকুরের লোক আক্রোশে দমাদম সেই ইট-বৃষ্টি করতে লাগল সৈন্যদের উপর। মাথায় লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

পরবর্তী ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠাকুর মরলেন বন্দুকের গুলিতে, আরও ষাট-সত্তর জন মারা গেল। কেল্লায় আগুন দিল, দাউ-দাউ করে সারা দিনরাত জ্বলল, ফট-ফট করে বাঁশের গিরা ফুটতে লাগল। বিয়াল্লিশ সনে ইস্কুল-বাড়ি জ্বলতে দেখেছি নিশিকান্ত। তার আগেও একবার নোনাখোলায় ভলন্টিয়ারদের আস্তানা। এসব থেকে সেকালের ছবি আন্দাজ করে নিই। একই ইতিহাসের রকমফের শুধু। ঠাকুরের অত দিনের অত আয়োজন নিশ্চিহ্ন হল দেখতে দেখতে। একটুখানি কেবল স্মৃতি আছে—এই বাঁশবন।

কেল্লার প্রাচীরে কতকগুলো যে গোড়ার বাঁশ পোঁতা ছিল, তাই থেকে নূতন নূতন বাঁশ জন্মেছে শতাব্দীকাল ধরে। কসাড় বাঁশবন এখন এই জায়গায়।

ঠাকুরের অসমাপ্ত মন্দিরের কিন্তু এতটুকু চিহ্ন নেই বাঁশবনে অথবা গ্রামের অন্য কোথাও। নাটার ঝোপে আচ্ছন্ন ইটের স্তূপ—মন্দির নয়, সাহেবপাড়া ঐ সামনে—নীলকুঠির ফটক ছিল ওটা। ক'দিনের বা ব্যাপার —আমার ঠাকুরমা নূতন বউ হয়ে এলেন, তখন হেলি সাহেবের দাপটে ইতর-ভদ্র সকলে তটস্থ। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। হেলি বলে নয়, সব সাহেবকে ক্রমশ বিদায় নিতে হয়েছে জাহাজ ভাসিয়ে। নীলকর সাহেবদের উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কিন্তু বাঁশের কেল্লার কথায় প্রবীণজনেরা ঘাড় নেড়ে বলেন, গাঁজাখুরি গল্প—এই কি হতে পারে, কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঁশ আর ইটের টুকরায় লড়াই? সামান্য একটু গ্রাম্য ঘটনা লোকের মুখে মুখে এই রকমটা দাঁড়িয়ে গেছে। আচ্ছা নিশিকান্ত, রামজয় ঠাকুরের কথা এতই কি অবিশ্বাস্য পরবর্তী ঘটনাগুলোর তুলনায়? জয়রামপুরের এক এক ফোঁটা ছেলে—আমাদের কানু-বাসু অবধি কি তাজ্জব দেখিয়ে গেল! পুরানো কাহিনী আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না পরবর্তী ব্যাপারগুলো স্বচক্ষে না দেখলে।

প্রবীণেরা যা-ই বলুন, ঠাকুরমার মুখে শোনা প্রতিটি কথা আমার শিশু-মনে গেঁথে গিয়েছিল। রামজয় ঠাকুরের মন্দিরের ইট রয়েছে নিশ্চয় বাঁশবনে কোনখানে চাপা পড়ে, সেই সব মড়ার হাড়-পাজরা ধুলো হয়ে বাতাসে উড়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে। অহরহ বাঁশবনে কটর-কট আওয়াজ ওঠে—ছেলেবেলা আমার মনে হত, রামজয় ঠাকুরের রক্তাক্ত সেই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বাঁশের আগায় আগায় পা ফেলে শূন্য মার্গে চলাচল করছেন।

শুধু তাঁরাই নন—বিদেশি নীলকর পরিবারের প্রেতাত্মাগুলিও। বুড়ি মেমের কুঠির পিছনে ভদ্রার কূলে বাউইলতায় ঢাকা কবরখানা রয়েছে, আতঙ্ক সেই জন্য আরও বেড়েছিল।

ছেলেমানুষ বলে নয়—বুড়োরাও নিতান্ত দরকার ছাড়া ঢুকতে চায় না বাঁশবনে। কেউ আসে না নিশিকান্ত। দিনদুপুরে শিয়াল চরে বেড়ায়, খরগোস ছোটে দু-কান উঁচু করে, বাদুড় ঘুমোয় নিচেমুখো মাথা ঝুলিয়ে। তলায় এখানে-ওখানে উলুঘাস, ন্যাড়াসেঁজি ও শেয়াকুলের ঝোপ। কে আসতে যাচ্ছে বল এদিকে, কার দায় পড়েছে ?

দায় পড়েছিল আমাদের—মুশকিলে পড়েছিলাম সেবার বিয়াল্লিশ সনের শেষাশেষি সময়টায়। ঘরে ঘরে পুলিশের দল হানা দিচ্ছিল, পাড়ার মধ্যে থাকা অসম্ভব হয়েছিল শেষের মাস কয়েক। আজকে নিশিকান্ত ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি—সেদিন ঐ সব ঝোপঝাপের আড়ালে পাকা বাঁশপাতার উপর আমাদের কায়েমি বিছানা হয়েছিল। শান্তি-বউদি তাকিয়া দিচ্ছিল মাথায় দেবার জন্য। তাকিয়ার বদলে একটা পাশ-বালিশ নিয়ে এলাম—ঐ এক পাশ-বালিসে এদিক-ওদিক মাথা রেখে অনেক লোকের শোওয়া চলে। ছিলাম মন্দ নয় নিশিকান্ত। রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে ডেকে চুপ করত, তখনই উৎসব পড়ে যেত ঘরে ঘরে। আলো নিভিয়ে দিয়ে উৎসব। ছায়ার মতো এক এক জন আমরা ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, দুয়োর খুলে তাড়াতাড়ি আপনজনেরা বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া—আমার দু-বছরের খুকি মাস তিনেকের মধ্যে কোনদিন আমায় দেখতে পায় নি—চারু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে আসত, আমি দু-চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে একটু আদর করে চলে যেতাম। সকাল হবার অনেক আগেই ঢুকতাম আবার বাঁশবনে। বরাবরই যে এখানে

ছিলাম, তা নয়। সময় সময় ছোট-লাইন ধরে দূরের কোন স্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপতাম, আবার ফিরে আসতাম। এদিককার কাজের ভার আমাদের উপর, অঞ্চল ছেড়ে পালাবার জো ছিল না। রোজই যে ঘরে এসে খেয়ে যেতে পারতাম, তা নয়। এক একদিন অচেনা মানুষ দেখা যেত গ্রামে, শাঁখ বেজে উঠত এবাড়ি-ওবাড়ি। শঙ্খ বাজানো ছিল সঙ্কেত। সে রাতে নিরম্বু উপোস যেত। কাছাকাছি খেজুরবনে ভাঁড় পেতেছে, কিন্তু বেরিয়ে এসে খেজুর-রস খেয়ে যাবে, তাতেও বড্ড কড়া রকমের মানা ছিল।

নীলকুঠির অনেক গল্প ঠাকুরমা বলতেন। বউ মানুষ নিজে কি-ই বা দেখেছেন—তাঁরও অন্যের মুখে শোনা। একটা তার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে আছে মনে। অপরূপ নাটকীয়তার জন্যই সম্ভবত।

ভদ্রা নদী দেখছ, নিশিকান্ত। স্রোতোহীন নদীর আজকে এমন অবস্থা যে কেউটেফণার ঝাড়গুলোকেও ভাসিয়ে নিতে পারছে না, পাড়ের কাছে বছরের পর বছর জমে এঁটে একশা হয়েছে, দেখলে মনে হবে—উর্বর মাঠের উপর সতেজ সবুজ ফসল ফলে আছে। পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে ঘাট তৈরি করে নিয়েছে। শেওলা-পচা পাঁক, পা দিলে হাঁটু অবধি ডুবে যায়, পা তোলা মুশকিল হয় তারপর। তাই বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে তার উপর বাখারির চালি ফেলা হয়েছে নদী-বিস্তারের প্রায় সিকি অবধি। বউ-ঝিরা ঐ অতদূর গিয়ে চালির প্রান্তে বসে বাসন মাজে, কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। স্নানের সময় ছেলেরা লাফিয়ে পড়ে ওখান থেকে নদীর গর্ভে।

আজকের এই মজা নদী অতি-দুর্দান্ত ছিল সে আমলে। শীতকালটা ছাড়া ভদ্রার ভদ্র চেহারা দেখা যেত না। নদীর কূলে বিস্তর নীলকুঠি। আউশ ধানের চাষ না করে চাষীরা ক্ষেতে নীলের বীজ ছড়াত। নীলগাছ

কেটে নৌকো বোঝাই করে নানা গাঙ-খালের পথে অবশেষে ভদ্রায় এসে পড়ত। সারি সারি দাঁড় বেয়ে অথবা বাদামি রঙের পাল খাটিয়ে যেত নীলখোলার দিকে। পাথরঘাটার ঘাটে এসে তারা নোঙর করত।

পাথর এ অঞ্চলে কোনখানে নেই, ঘাটের নাম তবু পাথরঘাটা। এগিয়ে চল নিশিকান্ত, বাঁকের মুখে কেয়ার ঘন জঙ্গল দেখতে পাবে। পাথরঘাটা বলে জায়গাটাকে। এখন ঘাট নেই, পাথরও নেই। সে আমলে নাকি চাটগাঁ থেকে আনা পাথর পুঁতে ঘাট চিহ্নিত করা ছিল, দেশ-বিদেশের ভরা এসে লাগত। এখন গালগল্প বলে মনে হয়।

ঐ সাদা দালান—বুড়ি-মেমের কুঠি ওর পুরাণো নাম। আগে খড়ের চালে ঢাকা ছিল। পুরাণো চাল পচে নষ্ট হয়ে যায়। দরজা-জানালা এবং দেয়ালেরও কোন কোন অংশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মেজেয় হাঁটুভর উলুঘাস জন্মেছিল। তারপর দরজা-জানলা পালটে কড়ি-বরগা বসিয়ে পাকা ছাত হল। বাবলার পিটানি দিয়ে দশ-বারো জনে ছাত পেটাল মাসখানেক ধরে, নদী থেকে শেওলা এনে ঢেকে দিল। এই তো বছর চারেক আগেকার কথা। প্রফুল্লর টাকায় হয়েছে এসব। ঘর মেরামত করে এখানে সে ছোটখাট এক হাসপাতাল করে দিয়েছে। প্রফুল্লর বিধবা বোন হাসি সকাল-বিকাল এসে দেখাশুনা করে। তার সতর্ক পাহারায় ভাল চলছে হাসপাতালের কাজকর্ম—মফস্বলের আর দশটা হাসপাতালের মতো নয়। মোটা থপথপে চেহারা, গলায় সরু হার—হাসিকে দেখতে পাবে আজকের সভায়। হয়তো সভারম্ভে গান গাইতে হবে তাকে। ভাল মেয়ে—বড্ড কোমল মন। দশের কাজে সব সময় সে অগ্রবর্তী।

কত রকম নক্সা খোদাই করা ছিল বুড়ি-মেমের কুঠির কবাটে। ময়ূরে সাপ ধরেছে, পালকি চড়ে চলেছে বর, ঘন জঙ্গলে হাতীর পিঠে বন্দুক হাতে

শিকারী যাচ্ছে বাঘ মারতে। এ হেন শৌখিন ঘরের উপরে বাঁশের চাল, বেতের বাঁধন, উলুখড়ে ছাওয়া। চালের আড়া-বাউনিতেই বা কত মূর্তি, বেতের বাঁধনগুলিতে কত রঙের বাহার! পাকা ছাতের অন্তত দশগুণ খরচ হয়েছিল এই চাল বাঁধতে। টুইডির স্ত্রীর ইচ্ছাক্রমেই এই রকম হয়েছিল—স্বামী আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে এই ঘরে তিনি সংসার পেতেছিলেন। টুইডিকে তিনি বলেছিলেন, উলুর ছাউনি দেখতে ভাল আর বেশ ঠাণ্ডা থাকে চোত-বোশেখের দিনেও। গাঁয়ের লোকদের মতো খোড়ো-ঘড়ে আমরা থাকব।

দালানের পিছনে পাশাপাশি দুটো জামরুলগাছের নিচে সেকেলে কবরখানা। বুড়ি-মেম অর্থাৎ মিসেস টুইডির কবর ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন। ফেলিসিয়ার কবর কিন্তু অবিকৃত আছে, মর্মর-ফলকের উপর লেখাগুলো সুস্পষ্ট পড়া যায়। টুইডি-দম্পতির বুড়া বয়সের একমাত্র সন্তান ফেলিসিয়া আঠার বছর বয়সে মারা যায়। নীলকমল মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিককার এই নির্জন নদীর ধারে এককালে অনেক ঘুরেছি। তখন কাঁচা বয়স—কবরের লেখা পড়তে পড়তে মন কেমন করে উঠত নিশিকান্ত। সমুদ্র-পারের আনীল-নয়না স্বর্ণকেশী এক কিশোরী মা'র কোলের কাছে শান্ত জামরুল-ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। কত সংঘর্ষের ঢেউ বয়ে গেল বারম্বার, ইংরেজের ভুবন-জোড়া সাম্রাজ্য চুরমার হল, ফেলিসিয়া কিন্তু গ্রামপ্রান্তে তেমনি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে বাংলার নীলের খ্যাতি। সাত-সমুদ্র পার হয়ে এক এক দল আসে, নীলের কারবারে ক' বছরের মধ্যে লাল হয়ে যায়। দেখে শুনে সমুদ্র-পারের দেশে দেশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মধুলোভী মৌমাছির মতো জাহাজের পর জাহাজ আসছে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কুঠি বসতে লাগল।

বাণ্ডিলের দাম চড়ল, চাষীরা দু-পয়সা পাচ্ছে। বীজ সংগ্রহের জন্য কুঠিতে

কুঠিতে ঘুরে নিজের গরজেই তারা নীল বোনে। গাছ কাটা হলে গরুর গাড়ি বা নৌকা যোগে নীলখোলায় মাল পৌঁছে দেয়। তৈরি আছে ওজনদার—শিকলে বেঁধে পাল্লায় তুলে সঙ্গে সঙ্গে ওজন হয়ে যায়। মুটেরা নীল বয়ে বয়ে বড় চৌবাচ্চায় ফেলে, কপিকলে কলসি কলসি নদীর জল তুলে গাছ পচান দেয়। নগদ টাকা বাজিয়ে নিয়ে বড়-সাহেব ছোট সাহেব দেওয়ান-গোমস্তা আমিন-তাইদগির সকলকে যথাযোগ্য সেলাম ও প্রণাম করে হাসিমুখে চাষী বাড়ি ফিরে যায় আগামী মরশুমে আবার দেখা হবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

তারপর কুঠিয়ালদের টনক নড়ল। পেটে-ভাতে থাকবার জন্য কি এতদূর এসেছে তারা? আইন পাশ করবার কথা হল—একটা কুঠি যেখানে আছে, তার দশ মাইলের মধ্যে নূতন কুঠি বসবে না। প্রতিযোগিতার অভাবে তা হলে বাণ্ডিলের দর পড়ে যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যত কুঠি বসে গেছে? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেদিকে খুশি গিয়ে দেখগে নিশিকান্ত, কত কনসারনের ধ্বংসচিহ্ন। অক্টোপাশের মতো একদা ওরা শতপাকে জড়িয়ে ধরেছিল এ অঞ্চলের গ্রামগুলি।

সব কুঠিয়াল মিলে ঠিক করল, বাণ্ডিল প্রতি চার আনার বেশি দেওয়া হবে না কোন ক্রমে। চাষীরা বিগড়ে গেল তখন—লাভ পড়ে মরুক, এ দরে পড়তা পোষায় না। নীল আর বুনবে না কেউ ক্ষেতে। লাঙল-গরু নিয়ে তারা ধান ও পাটের কারকিতে লেগে যায়। সাদা রং ও রাজার গোষ্ঠি বলে ভয় পায় না। মোরা নীল বুনব না—এই রব সর্বত্র।

এই গণ্ডগোলের মুখে টুইডি সাহেব আমাদের জয়রামপুর কবলা করে নিলেন নামখানার চৌধুরিদের কাছ থেকে। রেজেস্ট্রি-দলিল আমি নিজের চোখে দেখেছি। হাসপাতাল স্থাপনার সময় কুঠিবাড়ির দখল নিয়ে প্রফুল্লর

সঙ্গে চৌধুরিদের মামলা বাধবার উপক্রম হয়েছিল, তখন লারমোর সাহেবের পুরোণো কর্মচারী নকুলেশ্বর শুঁই অনেক খুঁজেপেতে মূল-দলিল বের করে দিয়েছিলেন। সেকেলে গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ভোগ-দখল করবার স্বত্ব টুইডি সাহেবের। কোথায় সেই টুইডির দল আজকে! বিদায় নেবার দিনে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখলের জন্য জমি তাঁরা ইংলণ্ডে তুলে নিয়ে যেতে পারেন নি, যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে, ভাঁট আশশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দের জঙ্গলে ঢেকে গেছে। সেই মূল্যবান দলিল এখন মহারাণীর মুখাঙ্কিত কাগজের উপর কতকগুলি দুর্বোধ্য অক্ষরের সমাবেশ মাত্র—নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন, ঐতিহাসিকের হয়তো কিছু কাজে লাগবে স্বাধীন-ভারতের ইতিহাস লিখবার সময়।

গ্রামের মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গে টুইডি আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। একেবারে মাটির মানুষ। চাষীদের বলেন, জমাজমি নিয়ে বসত করছি এখন তোমাদের সঙ্গে, তোমরা যে আমিও সেই। আলাদা করে ফেলে রেখো না বাপু সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে। যে ঝড় আসন্ন হয়েছিল, আপাতত তা স্থগিদ হল এইভাবে। গ্রামের কোন বাড়ি বিয়ে-থাওয়া বা ঐ রকম কোন অনুষ্ঠান হলে গৃহকর্তা টুইডির কুঠিতে এসে নিমন্ত্রণ করে যেত। সাহেব বুড়ি-মেমকে নিয়ে বিয়েবাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন, জোলাদের তাঁতে-বোনা শাড়ি আর ফেনি-বাতাসা সাজিয়ে আইবুড়োভাত পাঠাতেন। রথের বাজারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কুমোরের গড়া হাঁড়িবাঁশী কিনে উপহার দিতেন। কোন বাড়ি যাত্রা হলে আসরে উবু হয়ে বসে গান শুনতেন। গোঁফ-কামানো পরচুল ও ঘাঘরা-পরা সখী নাচতে নাচতে শ্রোতাদের ডিঙিয়ে এসে নাচত সাহেবের সামনে। ঘুরে ঘুরে নাচত, বেহালাদার এগিয়ে আসত সখীর পিছু পিছু। নাছোড়বান্দা। টুইডি মুখ

ফেরাতেন হাসতে হাসতে, সখী ঘুরপাক দিয়ে আবার গিয়ে সামনে দাঁড়াত। বেহালায় বোল উঠেছে, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—

দাও পয়সা, দাও পয়সা, পয়সা দাও—

টুইডি পয়সা নয়—ঝনাৎ করে আধুলি ফেলে দিতেন মাটিতে। সখী নাচের ভঙ্গিতে তুলে নিত, ঘুরে গিয়ে সেলাম দিত সাহেবকে। সারা রাত্রি জেগে সাহেব যাত্রা শুনতেন, সকালবেলা চোখ লাল করে উঠে যেতেন আসর থেকে।

দয়াবান ছিলেন সাহেব। কেউ কোন মুশকিলে পড়েছে শুনলে ছুটে যেতেন তার বাড়ি। সদরে সাহেব-ডাক্তার ছিল, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি এবং এ অঞ্চলের গোটা পনের কনসারনের সাহেব-মেমদের তিনি চিকিৎসা করতেন। ঘোড়ার পিঠে এবং কখন কখন পালকিতে ডাক্তারকে দূর-দূরান্তর যেতে হত চিকিৎসা-ব্যাপারে। পাগলা টুইডির কাণ্ড—কতবার তিনি চিঠি লিখে চাষা-ভুষোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাহেব-ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ঔষধ-পত্র দিতেন, টুইডির নামে হিসাব লেখা থাকত। চৈত্র মাসে সালতামামির মুখে টুইডি নিজে গিয়ে সমস্ত হিসাব মিটিয়ে আসতেন।

ফেলিসিয়া বুড়া বয়সের দুলালী। দু-তিনটা ছেলেমেয়ে শৈশব অবস্থায় মারা গিয়েছিল—ফেলিসিয়াকে তাঁরা তাই চোখে হারাতেন। এই পাড়াগাঁয়ের মধ্যেও মেয়ের গান-বাজনা লেখাপড়া ঘোড়ায় চড়া—কোন ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নি। বাংলা পড়াবার জন্য আগরহাটি থানার দারোগার সুপারিশ ক্রমে পীতাম্বর চাটুজ্জেকে নিযুক্ত করলেন। পীতাম্বর পাঠশালার পণ্ডিতি করতেন, বুড়া হয়ে আর পেরে উঠছিলেন না, এমনি সময়ে অভাবিত ভাবে নীলকুঠির কাজটা পেয়ে গেলেন। পণ্ডিতের সহজ সারল্যে টুইডি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন চাটুজ্জে পরিবারের উৎকট ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বেও। মেয়েও কতকটা বাপ-মায়ের স্বভাব পেয়েছিল,

গ্রামের লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় করত। প্রায়ই সে চাটুজ্জে-বাড়ি বেড়াতে যেত, পীতাম্বরের ছোট মেয়ে দুর্গার সঙ্গে তার বড় ভাব। শাড়ি পরে খালি পায়ে যথাসম্ভব দেশি সাজসজ্জা করে বেরুত সে এই সময়টা। পীতাম্বরের বউ সারদা সাগ্রহে তাকে আহ্বান করতেন। তবু ফেলিসিয়া দালানে উঠত না, উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত। দুর্গা ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে দু-জনে ঢেঁকিশালে কিম্বা পুকুর-ঘাটে গিয়ে গল্প-গুজব করত। ফেলিসিয়া বাংলা বুঝত, বলতেও শিখেছিল মোটামুটি। এমনি সারদার এত বাছবিচার, কিন্তু ফেলিসিয়ার সম্পর্কে কড়াকড়ি ছিল না। বলতেন, আর জন্মে ফেলিসিয়া ভাল বামুনের মেয়ে ছিল, কপাল-দোষে ম্লেছ-ঘরে জন্মালেও আচারে-বিচারে পূর্বজন্মের ছাপ রয়ে গেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও নরম তরিবৎ দেখেই তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু লোকে বলাবলি করত, ভাত জুটছে টুইডির দয়ায়—তাঁর মেয়ের ম্লেচ্ছদোষ খণ্ডে যাবে, এ আর বেশি কথা কি!

দুর্গা ফেলিসিয়ার চেয়ে তিন বছরের বড়। সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে এটি, পীতাম্বর শখ করে কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছেন, শুভঙ্করী এবং সমগ্র পাটিগণিতখানা শেষ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের কোন উপায় করা যাচ্ছে না। বড় দু'টিকে অনেক কষ্টে পার করা গেছে, এখন এইটিতে এসে ঠেকেছে। নৈকষ্য কুলীন বংশ—পালটি ঘর খুঁজে পাত্রস্থ করা সোজা নয়। সে রকম সঙ্গতি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। এর উপর আর এক উপসর্গ—মা হয়ে সারদাই অসুবিধা ঘটাচ্ছেন সব চেয়ে বেশি। অতবড় মেয়ে আইবুড় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—পীতাম্বরের মুখের হাসি চোখের ঘুম ঘুচে যাবার উপক্রম, কিন্তু সারদা ধনুক-ভাঙা পণ করে আছেন, যে সে ঘরে তিনি মেয়ে দিতে দেবেন না।

একটা পাত্র হাতের কাছে আছে—উত্তরপাড়ার কেশব। কুলশীল গাঁইগোত্র মেলপ্রবর খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হয়তো নয়,

কিন্তু একটা বড় সুবিধা এই যে মাথার উপর অভিভাবক না থাকায় টাকা-পয়সা নিয়ে দরদস্তুর হবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এরই উপর ভরসা করে পীতাম্বর আগে তেমন চাড় করেন নি। স্বচ্ছন্দে মেয়ে এত বড় হয়েছে। ছেলেবয়সে কেশব তাঁর পাঠশালায় পড়েছে। একটা ক্ষমতা ছিল—সে বিষম মার খেতে পারত। পীতাম্বর হরদম পিটাতেন। বেতের চোটে কালসিটে পড়ে গিয়েছিল, নিরিখ করে দেখলে এত কাল পরেও অস্পষ্ট দাগ মিলতে পারে। পিঠ কেটে চৌচির হয়ে যেত, তবু দশমিক ভগ্নাংশ কিছুতে তার মাথায় ঢুকত না। কায়ক্লেশে বছর তিন-চার কাটিয়ে অবশেষে পীতাম্বরেরই দাপটে পড়াশুনায় তাকে ইস্তাফা দিতে হল।

তবু কেশব সুশীল ছেলে—এত মার খাওয়া সত্ত্বেও পীতাম্বরকে সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বয়সের সঙ্গে ভক্তি বেড়েছে আরও। নানা কাজকর্মে পীতাম্বরের বাড়ি আসে। সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে পীতাম্বর সুপ্রাচীন দোতলার জীর্ণ ঝুল-বারাণ্ডার প্রান্তে মাদুর পেতে গড়িয়ে পড়েন, ঘরের ভিতর মিটি-মিটি রেড়ির তেলের দীপ জ্বলে। প্রদীপ উসকে দিয়ে কেশব অভিনিবিষ্ট হয়ে শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষে। মাঝে মাঝে পীতাম্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তন্দ্রার ঘোরে পীতাম্বর যা-হোক এক রকম জবাব দিয়ে যান। এ নিয়েও কথা উঠেছে পাড়ার মধ্যে।

হেঁ-হেঁ, আসে কি আর পীতাম্বর পণ্ডিতের কাছে ?

সারদা বিরক্ত। বলেন, কি জন্য আসে যখন-তখন ? মেয়ে বড় হয়েছে, মানা করে দিও।

পীতাম্বর বলেন, দশমিক ভগ্নাংশ বুঝে নিতে আসে। এদ্দিনে মনে ঘেন্না হয়েছে। দুগ্‌গার সঙ্গে দশমিক নিয়ে আলোচনা করে, লক্ষ্য করে দেখেছি।

সারদা বলেন, থাক তো তুমি চোখ বুজে। কি করে দেখ ?

পীতাম্বর তিলমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেন, চোখে না দেখি, কান আমার ঠিক খাড়া থাকে। যা ওরা বলাবলি করে, সমস্ত কেবল পাটীগণিতের কথা।

অবশেষে একদিন মনের অভিপ্রায় সসঙ্কোচে তিনি সারদার কাছে ব্যক্ত করলেন।

কি রকমটা হয় তা হলে ?

সারদা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে ? বরং আমি মেয়ের হাত-পা বেঁধে ভদ্রার জলে ফেলে দেব। গাঁজা-গুলি খেয়ে বেড়ায়—ঠাউরেছ চমৎকার !

কেশব গাঁজা-গুলি খায়, এর কোন প্রমাণ নেই। তামাকটা অবশ্য খায় খুব। কিন্তু গুরুস্থানীয়দের বিশেষ সমীহ করে, পীতাম্বর বা সারদা এতটুকু বেচাল কোন দিন দেখতে পায় নি। বর্ষার সময় একদিন সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি-বাদলা বড় চেপে পড়ল। চাটুজ্জে-বাড়ি থেকে উত্তরপাড়া ক্রোশখানেক হবে। পীতাম্বর প্রস্তাব করলেন, কি হবে বাবা এই ভন্নার মধ্যে বাড়ি গিয়ে ? খিচুড়ি খেয়ে বৈঠকখানার ফরাসে আমার পাশে পড়ে থাক। তোর মাকে বল দুগ্‌গা, চাদর পেতে ছোট মশারিটা খাটিয়ে দিয়ে যেতে।

কেশবের ইচ্ছা নয়, পণ্ডিত মশায়ের পাশে ঐ ভাবে টনটনে হয়ে পড়ে থাকা। কিন্তু উপায় নেই তা ছাড়া। অবিশ্রান্ত জল হচ্ছে।

পীতাম্বরের ঘন ঘন তামাক খাওয়া অভ্যাস ! গন্ধকের কাঠি আর আগুনের মালসা সাজানো থাকে তাঁর শয্যার পাশে—অনেক রাত্রে উঠে প্রদীপ ধরিয়ে তিনি তামাক সাজতে বসলেন। আলো চোখে পড়ে কেশবেরও ঘুম ভেঙেছে। মশারির ভিতর থেকে লোলুপ চোখে দেখছে, পরম আরামে পীতাম্বর মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ধুম উদ্গীরণ করে চলেছেন। দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, মশা ঢুকেছে নাকি বাবা ?

আজ্ঞে না।

বাঁ-হাতের থাবা দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশব অনুভব করল, হুঁকো তার গায়ে ঠেকছে। বিবেচনা আছে পণ্ডিত মশায়ের। আলো নিভিয়ে ইজ্জত অক্ষুন্ন রেখে মশারি উঁচু করে ছাত্রের দিকে হুঁকো এগিয়ে ধরছেন। কেশবের বড় ইচ্ছা করে, অন্ধকারে তখনই একবার পীতাম্বরের পায়ের ধুলো নেয়।

রাতের মধ্যে আরও তিন-চার বার এই রকম চলল। প্রত্যেক বারই পণ্ডিত মশায়ের প্রসাদী তামাক নির্ঝঞ্ঝাটে মুখের কাছে এসে পৌঁচেছে।

সকালবেলা সারদা বিছানা তুলতে এসে দেখলেন, নূতন মশারির তিন-চার জায়গায় পুড়ে গোলাকার ছিদ্র হয়েছে। আয়েস করে টানতে টানতে জলন্ত টিকের কুচি পড়ে গেছে, ঘুমের ঘোরে কেশব টের পায় নি। পীতাম্বরের উপর তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, খবরদার বলছি—কখনো তুমি আস্কারা দেবে না গেঁজেল ছোঁড়াটাকে। কোন দিন সে যেন আর এ বাড়িমুখো না হয়।

গ্রহ এমনি, একটু পরেই কেশব মুখোমুখি পড়ে গেল। সারদা বললেন, দুগ্‌গা ছোটটি নেই—কেন বাছা তুমি এত আসা-যাওয়া কর? আর এস না—খবরদার।

সারদা বেঁকে বসেছেন, পাহাড় নড়ে তো তাঁকে নড়ানো যাবে না। অগত্যা কেশবের আশা ছেড়ে দিয়ে পীতাম্বর একদিন মহিষখোলায় সম্বন্ধ করতে গেলেন।

নীলখোলায় বড় ভিড়। প্রজারা দরবার করতে এসেছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও কেশব ঐ দলের মধ্যে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বিষম গরম। খালি-গা টুইডি সাহেব ডাবের জল খেতে খেতে

যে যা বলছে মনযোগ দিয়ে শুনচেন। বাণ্ডিলের দাম বাড়িয়ে দেবার কথায় আঁৎকে উঠলেন তিনি। সর্ব্বনাশ, জাত-ভায়েরা তা হলে একঘরে করবে আমাকে। এমনই কত কি বলাবলি করে! দর বাড়ানো একলা আমার ইচ্ছেয় হবে না। যেখানে যত কুঠি আছে সকলকে নিয়ে টান পড়বে, সকলের মত দরকার।

ব্যাপার তাই বটে। দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। নীল চাষে রায়তদের বিতৃষ্ণা। কুঠিয়ালেরা কৌশল ও জবরদস্তি করে নীল বুনতে বাধ্য করাচ্ছে, তার ফলে কয়েক জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়ে গেছে। জয়রামপুর এলাকায় কোন গোলযোগ ঘটে নি। পাগলা বলে টুইডির সম্পর্কে প্লান্টার-সমাজের অবজ্ঞা আছে, দেশী লোকের সঙ্গে এত মেলামেশা সাহেবরা ভাল চক্ষে দেখে না। এখন দেখা যাচ্ছে, তাঁর কোম্পানির কুঠিগুলোই মোটের উপর ভাল চলছে। তবে ঢেউ আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার পরিচয় চাষীদের এই দরবার করতে আসা।

টুইডি কোমল কণ্ঠে বললেন, ও কথা থাক। দশের ব্যাপার—আমার একলার কিছু করবার নেই। তোমরা এসেছ আমার কাছে—তোমাদের কার কি অসুবিধা হচ্ছে, তাই বল। গেল-বর্ষায় সারা জেলায় কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল, জয়রামপুরে কারো বাড়ি একবেলার জন্যও উনুন নিভে থাকে নি। এবারও সেই রকম হবে। বলে ফেল, কে কি চাও।

অপ্রতিভ হয়ে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সত্যিই তো, কত জনে কত দিন সাহেবের দাক্ষিণ্য মুঠো ভরে নিয়ে গেছে! হাত পাতলেই টাকা—তখন এ ভাবে দল বেঁধে টুইডির মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো উচিত হয় নি।

পীতাম্বর ফেলিসিয়াকে পড়িয়ে ফিরছিলেন। ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালেন। টুইডির নজর পড়ল, ডাক দিলেন, শোন পণ্ডিত—

সকলের সব ব্যাপারে সাহেবের আগ্রহ। কিম্বা হয়তো চাষীদের কথাবার্তা থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন। বললেন, কি হল—সেই যে কোথায় সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলে?

দুর্গাকে সোমবারে দেখতে আসবে।

টুইডি পাত্রপক্ষের পরিচয় নিতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কেশব ইতিমধ্যে চলে গেছে; আর সকলেও দুই-একে ক্রমশ চলল। তাদের গমন-পথের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে টুইডি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লোক মহিষখোলার তারা? অবস্থা কেমন?

পীতাম্বর বলতে লাগলেন, তালুক-মুলুক আছে। চক-মিলানো বাড়ি। চার ভাই, এটি হল মেজো—

তারপর উচ্ছ্বাস থামিয়ে বললেন, মেয়ে যদি পছন্দ হয় আর দাবিদাওয়ায় না আটকায়, কাজটা হয়ে যেতে পারে।

টুইডি বললেন, আমায় নিমন্ত্রণ করে যাও পণ্ডিত, আমি থাকব মেয়ে-দেখানোর সময়। পছন্দ যাতে করে আর দাবিদাওয়ার জন্য না আটকায়—সে ভার আমার উপর।

কি ভেবে বললেন, কে জানে! যথাসময়ে গিয়ে সাহেব পীতাম্বরের বৈঠকখানায় ফরশা চাদর-পাতা ফরাসের উপর চেপে বসলেন। কুঠি থেকে তাঁর ফুরসিটা আনা হয়েচে, তামাক টানছেন আর আলাপ জমানোর চেষ্টা করছেন পাত্রপক্ষীয়দের সঙ্গে। জুত হচ্ছেনা, তারা সসঙ্কোচে একপাশে চুপচাপ বসে আছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে নিতান্ত না বললে নয় এমনি দুটো-একটা কথার জবাব দিচ্ছে।

উঁকি দিয়ে এক নজর দেখে সারদা পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঝাঁক-বেঁধে এসেছে যে! অতগুলো কারা?

বরের খুড়ো এসেছেন, ছোট ভাই এসেছে। জ্ঞাত-কুটুম্বদের ক'জন আছেন। তার উপর পুরুত ঠাকুর, সেরেস্তার লোক একটি···জমিদারি ঠসক, —বুঝলে না?

সারদা বললেন, যাই বল, বরকে আমি একটু দেখতে পারি, তার ব্যবস্থা কর। তোমায় বিশ্বাস নেই, তারার বেলা যা হয়েছিল, তা আমি কখনো হতে দেব না।

তারা হল বড় মেয়ে। বিয়ের দশ-বারো বছর পরে হাঁপানি রোগ হয়েছে বড় জামাইটির। সারদা বলেন, রোগ পূর্বাবধি ছিল, পীতাম্বর অবহেলা করে বিয়ের আগে যথেষ্ট খোঁজ-খবর নেন নি।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পীতাম্বর বললেন, তা হলে চল মহিষখোলার বাড়ি। কি বৃত্তান্ত? না, শাশুড়ী এসেছেন হবু-জামাই পছন্দ করতে—

সারদা রাগ করে বলেন, যাবার কথা বলছি নাকি আমি? কিন্তু তুমি যে, যাকে সামনে পাবে, ধরে এনে তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দেবে—সে আমি আর হতে দিচ্ছি নে।

পীতাম্বর বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, মহিষখোলার গাঙ্গুলী—তারা যে সে মানুষ হল? ফটকের পাশে আগে হাতী বাঁধা থাকত। পিলখানা রয়েছে এখনো। তে-মহলায় থাকে, মোণ্ডামিঠাই খায়, সোনাদানা পরে, রোগপীড়া সে বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁসতে পারে না। বর না হল, বরের ছোট ভাইকে দেখে নাও। দু-ভাই প্রায় এক রকম। ওর থেকে আন্দাজ করতে পারবে।

সারদা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌টি বল তো?

কোঁকড়া চুল, গলায় সোনার হার, গরদের পিরান গায়ে দিয়ে এসেছে—

উৎসাহের আতিশয্যে সারদা বৈঠকখানার কানাচে চললেন। পাতিনেবুর ডাল সরিয়ে সন্তর্পণে জানলার ফাঁকে স্বামীর বর্ণনা মতো দেখলেন বরের ছোট ভাইকে।

পীতাম্বর তখন বৈঠকখানায় আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন। আবার তাঁকে ডাকিয়ে আনলেন। মুখ কালো করে বললেন, অত আর খোশামুদি করতে হবে না। সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

পীতাম্বর আকাশ থেকে পড়লেন।

হল কি হঠাৎ?

সারদা বললেন, ঐ যদি ছোট ভাই হয়, পাত্রের বয়স তবে তো তোমার কাছাকাছি হবে। বুড়োর সঙ্গে দুগ্গার বিয়ে দেব না।

পীতাম্বর বোঝাবার চেষ্টা করেন, বড় মানুষ—টাকার আণ্ডিলের উপর বসে রয়েছে, দেদার খাচ্ছে, তাই ঐ রকম মুটিয়ে গিয়েছে। দূর থেকে দেখেছ, বয়সের আন্দাজ করতে পার নি।

সারদা ঘাড় নেড়ে আরও প্রবল কণ্ঠে বলেন, কালোর গুষ্টি ওরা। ভাইকে দেখলাম, খুড়োকেও দেখলাম। হাতীর মত মোটা, হাঁড়ির তলার মতো কালো—মেয়ে আমার ভয়েই মারা পড়বে ওদের বাড়ি গেলে।

ভবতারিণী পীতাম্বরের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় বোন—এই বাড়িরই লাগোয়া ভাইপোর সংসারে থাকেন। তিনি এসেছেন। সারদার কথায় তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

এ কি আধিক্যেতা বউ? মেয়ে যতক্ষণ ঘাড়ের উপর, অমন কথা কখনো মুখে আনবি নে, খবরদার! একটু গায়ে-গতরে হবে না তো কি পাকাটির মতো জামাই করতে চাস? রং কালো তো বয়ে গেল—ছেলে কালো আর ধান কালো!

বাড়িসুদ্ধ সবাই বিপক্ষে, প্রাণপণে বোঝাতে চাচ্ছে তখন সারদা মেয়ে নিয়ে দোতলার কুঠুরিতে খিল এঁটে দিলেন।

পীতাম্বর ব্যাকুল হয়ে দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছেন।

কি পাগলামি করছ, ভদ্রলোকেরা কি মনে করবেন বল তো? বিয়ে ওখানে না দিতে চাও, মেয়ে দেখতে দিলে ক্ষতিটা কি?

অনুরোধ ঝগড়াঝাটি—কোন রকমে দরজা খোলানো গেল না। বিষম একগুঁয়ে সারদা—কেউ তাঁকে বাগ মানাতে পারে না। পীতাম্বর তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বৈঠকখানায় এসে বললেন, মেয়ে হঠাৎ কেন জানি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, জল ঢালাঢালি হচ্ছে, কখন সেরে উঠবে ঠিক নেই। নিজ-গুণে মাপ করে নেবেন আপনারা।

ভদ্রলোকদের সামনে ঠাস-ঠাস করে পণ্ডিত নিজের গাল চড়াতে লাগলেন।

নৌকা যাচ্ছে ভাঁটার টানে মন্থর গতিতে। একখানা একেবারে ঘাটের কাছে এসে পড়েছে, ছপ-ছপ করে বোঠে বাইছে—বোঠের জলের ছিটে লাগল দুর্গার গায়ে। পিছন ফিরে কুটুম্বদের এঁটো-বাসন মাজছিল, রাগ করে সে মুখ ঘোরাল। তখন আর রাগ রইল না, হাসির আভা মুখের উপর। ডিঙির মাথায় কেশব মাঝি হয়ে বসেছে, নীলের ভরা নিয়ে যাচ্ছে।

দশমিক ছেড়ে হাল হাতে নিয়েছ? ঠিক হয়েছে, যাকে যা মানায়!

কেশব হেসে বলে, পণ্ডিত মশায় বরাবর বলতেন, গোবর-পোরা মাথা—চাষার ঘরে জন্মালি নে কেন হতভাগা? গুরুজনের ইচ্ছে—বামুনের ঘরে জন্মেও শেষ পর্যন্ত সেই চাষা হতে হল।

ভ্রূ কুঁচকে দুর্গা বলে, ধরলে কিনা নীলের চাষ!

কেশব বলে, হাঙ্গামা কম—খদ্দেরের জন্য ভাবতে হয় না। দুটো পেট আমাদের—বেশ চলে যায়। আর দরবার করে ফল হয়েছে, বাণ্ডিলের দর বেড়ে যাবে শুনছি টুইডির চেষ্টায়।

তারপর দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে সহসা জিজ্ঞাসা করল, তুই যে এখানে—ছেড়ে দিল এর মধ্যে?

প্রশ্ন কানে না নিয়ে দুর্গা বলল, নীলখোলায় যাচ্ছ—তা উজান বেয়ে মরছ কেন এদ্দূর উল্টো এসে?

কেশব বলে, যাচ্ছি—ধীরে সুস্থে গিয়ে পৌঁছব। এই ক'টি মাল মোটে—সন্ধ্যের মধ্যে গিয়ে, ওজন ধরিয়ে দিলেই হল। কাজ চাই তো একটা—কি করি বসে বসে সমস্ত বিকালবেলা! বোঠে বেয়ে বেয়ে তাই হাতের সুখ করে নিচ্ছি।

আবার প্রশ্ন করে, কুটুম্বরা চলে গেছে? সাজ-গোজ করিস নি, চুল বাঁধিস নি, কপালে সিঁদুরের টিপও দিস নি—

মুখ টিপে হেসে দুর্গা বলে, সাজ-গোজের দরকার হল না। এমনিতেই পছন্দ করে গেছে।

বলিস্ কি?

চারিদিক দেখে নিয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুর্গা বলল, তাই তো বলল। খু—উ—ব পছন্দ ওদের।

বকিস নে। দুর্গার মুখের উপর আবার একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে কেশব বলল, কি আছে তোর চেহারায় পছন্দ করবার?

আচ্ছা, দেখতে পাবে এই শ্রাবণে—

আশ্চর্য হয়ে কেশব বলে, আমার মতো গাধা আরও আছে তা হলে দুনিয়ায়?

গাধা নয়, মহিষ। বলতে বলতে দুর্গা হেসে ফেলল। বলে, মা বলছিল,

মহিষখোলা থেকে একদল মহিষ নেমন্তন্ন করে এনেছেন বাবা। কালো কুঁদ আর এই মোটা—

মুখভঙ্গি করে দু-হাতে দুর্গা স্থূলত্বের যে পরিমাণ দেখাল, তাতে হো-হো করে হেসে ওঠে কেশব। বলে, তাই—আসবে দেখিস ঐ রকম সব দু-পেয়ে জন্তু-জানোয়ার। এ জন্মে কলাতলায় তোকে যেতে হবে না, এই একটা কথা বলে দিলাম।

আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, মশারি পুড়িয়ে দিয়েছি—ভাল মুখে বললেই হত, একখানার জায়গায় দু-খানা আমি কিনে দিতাম। তা নয়—বাড়ি ঢুকতে মানা হয়ে গেল। মনে বড্ড দাগা দিয়েছেন সত্যি তোর মা।

পরদিন পীতাম্বর কুঠিতে গেলে টুইডি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে কেমন আছে পণ্ডিত? সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলে ঐ রকম ফিট হয়ে পড়া ভাল কথা নয়। আমি বরং চিঠি লিখে দিচ্ছি ডাক্তার টমসনের কাছে, মেয়েকে একদিন সদরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন।

একটু ইতস্তত করে অবশেষে পীতাম্বর সমস্ত খুলে বললেন। দুঃখিত-স্বরে বললেন, আমি দেখছি সাহেব, বিয়ে দুর্গার অদৃষ্টে নেই। সর্ব্বাংশে সুন্দর পাত্র আমাদের মত অবস্থার লোকে কেমন করে যোগাড় করবে?

টুইডি হেসে আকুল। সরল প্রাণখোলা হাসি। বলেন, ফরশা ছেলে না হলে পছন্দ নয় তোমার স্ত্রীর? আমাদের হেলির সঙ্গে হয় তো বল। বরকর্ত্তা হয়ে জাঁকিয়ে বসে একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি। আমার গায়ের রং দেখে নিশ্চয় দুয়োরে খিল এঁটে দেবেন না তোমার স্ত্রী।

একটুখানি থেমে বলেন, সে তো হবার জো নেই। তোমাদের পালটি ঘর নই—রং পছন্দ হলেও কুলে শীলে মিলবে না যে!

ডেনিস হেলি টুইডির ভাগিনেয় সম্পর্কীয়। ছোকরা মানুষ—ভারি তুখড়, আগরহাটি কন্‌সার্নের ম্যানেজার। প্রতি রবিবার সকালবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসে জয়রামপুরের গির্জায় প্রার্থনা করতে। সমস্ত দিন থেকে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। মাছ-ধরার শখ আছে, ছিপ নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে। ফেলিসিয়া উপকরণ যোগাড় করে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে, তারপর এক সময়ে ছায়ার মতো বসে পড়ে তার পাশটিতে। চারের মাছ পালিয়ে যাবে সেজন্য কথা-বার্তা বলবার উপায় নেই। একবার সজোরে ছিপে টান দিয়ে ব্যর্থতার লজ্জায় হেলি যখন ফেলিসিয়ার দিকে তাকাত, ফেলিসিয়া তখনও একটা কথা বলত না, দেখা যেত তার চোখ দুটো হাসছে শুধু। শীতকালের দুপুরে মাছ ধরতে না বসে কখন কখন তারা দু-জনে দুই বন্দুক নিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে পাখী শিকার করে বেড়াত। গ্রামের মধ্যে গিয়ে পীতাম্বর পণ্ডিতের হুড়কোর ধারে গিয়ে দাঁড়াত হয় তো কোন দিন। পীতাম্বর সসম্ভ্রমে ডেকে বসাতেন, ডাব আর খেজুর-চিনি খেতে দিতেন। এমনি করে হেলির সঙ্গেও পীতাম্বর-পরিবারের জানাশোনা হয়েছিল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এই সময়ে এক বিপর্যয় ঘটল, নিশিকান্ত। ওলাউঠায় ফেলিসিয়া মারা গেল। টুইডি এর পর বেঁচে রইলেন বটে—কিন্তু কাজকর্ম দেখেন না, ঘর থেকে বেরোনই না মোটে। ষাট বৎসর বয়স দেহ এতটুকু বাঁকাতে পারে নি, কুঠিবাড়ির ঐ প্রাচীন দেবদারুগাছটির মতোই বরাবর তিনি খাড়া ছিলেন। দুর্ঘটনার পর সেই মানুষ রাতারাতি অথর্ব বুড়ো হয়ে পড়লেন।

আগরহাটি থেকে হেলিকে নিয়ে এসে টুইডি জয়রামপুরের সদর-কুঠিতে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। আর কিছুদিন পরে এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক

ঢুকিয়ে তিনি জাহাজে চড়লেন, ছায়াচ্ছন্ন জামরুল-তলায় ভদ্রার কূলে আদরের মেয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা দুটো করে ক্রমশ সকল নীলকুঠির এলাকায় গোলযোগ প্রবল হয়ে উঠল। অশান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে জয়রামপুরেও। টুইডি তাঁর সহৃদয়তার বাঁধ দিয়ে এত দিন আন্দোলন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি চলে যাবার পর হেলির পক্ষে সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বয়স কম হেলির—কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপ। টুইডির আমলের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আগাগোড়া উলটে গেছে। কতকটা কোম্পানির ইচ্ছায়, কতকটা হেলির নিজের বুদ্ধিতে। বুড়ো টুইডির যে কোন ব্যবস্থা ইণ্ডিগো-কোম্পানি চোখ বুজে অনুমোদন করত, হেলির আমলে সেটা আর সম্ভব নয়। প্রজারা হাত পাতলেই আর টাকা পায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়, নায়েব-গোমস্তার তোয়াজ করতে হয়, বাজে খরচও করতে হয় প্রচুর। আর দেখা গেল, টুইডি সাহেব যত সদাশয়ই হোন, যাকে যা দিয়েছেন সমস্ত পাকা-খাতায় লেখা রয়েছে, সিকি পয়সার হেরফের হয় নি।

হেলি মারমুখি হয়ে বলে, কোম্পানির টাকা দাদন নিয়ে নিয়ে বসে আছে—চালাকি নাকি? না পোষায় টাকাকড়ি শোধ করে জায়গা-জমি ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ছেড়ে সব চলে যাক। নিজ-আবাদি চাষ করব, ওদের ভিটের উপর নীল বুনব আমি।

পীতাম্বরের সম্পর্কেই অনুগ্রহ পূর্বাপর বজায় আছে। টুইডি কিছু বলে গিয়েছিলেন কিনা কে জানে—হেলি একদিন কুঠির তাইদগিরকে দিয়ে পণ্ডিতকে ডেকে পাঠাল।

দেখতে পাওয়া যায় না পণ্ডিত মশায়কে। কেনই বা আসবেন—যাকে পড়াতে আসতেন, সে-ই যখন চলে গেল।

হেলির গলার স্বর ভারি হল। কি লিখছিল—মিনিটখানেক খস-খস করে লিখে চলল। তারপর মুখ তুলে পীতাম্বরের দিকে চেয়ে বলল, ফেলিসিয়ার শিক্ষক আপনি। আঙ্কলের প্রতিশ্রুতি আমি বর্ণে বর্ণে পালন করব। মেয়ের বিয়ের যোগাড়ে লেগে যান, কোন রকম ভাবনা করবেন না।

পীতাম্বর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে কুঠি থেকে ফিরলেন। এমন সদাশয় আশ্রিত প্রতিপালকদের বিরুদ্ধে লোকে জোট বাঁধছে! ভদ্র-সন্তানরাও নাকি জুটেছে পিছনে। একটিকে তো দেখেছেন তিনি—কেশব—টুইডির কাছে দরবার করতে এসেছিল চাষা-ভুষার সঙ্গে। এরাই সব পরামর্শ দেয়, খবরের কাগজে চিঠি ছাপায়। এদের আশকারা পেয়েই তো সাহেবের চোখরাঙানিতে ভয় পায় না আর রায়তেরা। শোনা যাচ্ছে, সদরে অনেক দরখাস্ত পড়েছে কুঠিয়ালদের নামে। কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, আবার জলেও বাস করবে—দুটো এক সঙ্গে কি করে চলবে, সে ঐ মন্ত্রণাদাতা বুদ্ধিমন্তর দল জানে?

হেলির কাছ থেকে স্পষ্ট ভরসা পেয়ে পীতাম্বর আবার নব উদ্যমে পাত্র খুঁজতে লাগলেন! নিশ্চেষ্ট কোন দিনই ছিলেন না! এখন সারদা গত হয়েছেন—যে সম্বন্ধই আসুন, তা নিয়ে খুঁত-খুত করবার মানুষ নেই! অনেক দেখেশুনে বড়-আশা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের সংস্থান আছে, এমনি যেমন-তেমন একটা পাত্র জুটলেই কন্যাদায়ের পাথর গলা থেকে নামিয়ে রেহাই পান। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। আগে হয় নি সারদার জন্য, এখন যে কার জন্য—কে এমন সজাগ সতর্ক থেকে শত্রুতা সাধছে, সঠিক সেটা ধরা যাচ্ছে না। ধরতে পারলে পীতাম্বর পণ্ডিত তার কাঁচা মুণ্ড চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন।

প্রায়ই কুটুম্ব আসছে দুর্গাকে দেখতে। এসে খেয়েদেয়ে রকমারি ভদ্রতার কথা বলে চলে যায়। এর জন্য এতদিনে যা খরচপত্র হল, তাতে বোধ করি

তিন-চারটে মেয়ে পার হতে পারে। ঘুরে ঘিরে কেশবের কথাও উঠেছিল, কিন্তু এখন পীতাম্বরই সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আগরহাটি থানার দারোগা মধুসূদন সরকার—পীতাম্বরের পুরুষানুক্রমিক শিষ্য। বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তিনি পীতাম্বরকে। কুঠিয়ালদের সঙ্গে মধুসূদনের খুব দহরম-মহরম, কাজের গরজেই পরস্পর খাতির জমেছে। তিনি অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ করলেন কেশবের সম্বন্ধে। অত্যন্ত ভয়ানক কথা, লাঠি-সোটা ঢাল-শড়কির ব্যাপার। শুনে পীতাম্বর শত হস্ত পিছিয়ে এলেন। সে যাক গে—যে পাতে খাওয়া হবে না, তা কুকুরে চাটুক। মোটের উপর আরও তিন বছরের অবিরত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কিছু সুবিধা হচ্ছে না। এক হতে পারে, বয়স বেড়ে যাওয়ার দরুন দুর্গার চেহারার লালিত্য নষ্ট হয়েছে। অন্য কারণও আছে বলে পীতাম্বরের প্রবল সন্দেহ। কিন্তু সেটার ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছে না কোন রকমে।

দুধপুকুরের রায়-বাড়িতে কথাবার্তা চলছে। ঘনশ্যাম রায় মেয়ে দেখতে রওনা হবেন, এমনি সময় উড়ো চিঠি এসে উপস্থিত। অচেনা কে-একজন হাটুরে মানুষের হাতে এই চিঠি দিয়ে রায়-বাড়ি পৌঁছে দিতে বলেছে। লিখেছে—ভাল মেয়ে নয়। কুঠির সাহেব অঢেল টাকা খরচ করতে রাজী এই মেয়ের বিয়েয়—তবু যে বিয়ে হচ্ছে না, ভিতরে 'কিন্তু' আছে বলেই।

চিঠিটা হাতে করে ঘনশ্যাম স্ত্রীর কাছে এলেন।

কাণ্ড দেখ। কত রকমের শত্রুতা মানুষ যে করে!

গিন্নি বললেন, সত্যিও তো হতে পারে? আমাদের অত কি মাথাব্যথা—মেয়ের কিছু মন্বন্তর হয় নি। বেরুচ্ছ—বেশ তো, ওখানে না গিয়ে কাশিমপুরে পাকাপাকি করে এসোগে।

দিন চার-পাঁচের মধ্যেও ঘনশ্যামের সাড়াশব্দ মিলল না, তখন পীতাম্বর নিজে চলে এলেন ভাইপো সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে।

খবর কি রায় মশায়?

বড় লজ্জিত আছি ভায়া। কাশিমপুরের ওঁরা এসে পড়েছিলেন। আর গিন্নিরও একান্ত ইচ্ছে—ওঁর মামার বাড়ির সম্বন্ধের মধ্যে পড়ে যায় কিনা! ঐখানে দিনক্ষণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

রাস্তায় এসে পীতাম্বর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

ছোটলোক—পাজির পা-ঝাড়া। বাঁদর নাচাচ্ছে যেন বেটারা আমায় নিয়ে এই তিন বচ্ছর। বুড়ো মানুষ বলে দয়ামায়া নেই। কথাবার্তা ঠিকঠাক—তার মধ্যে কাশিমপুর হঠাৎ এসে পড়ল কি করে?

সুখময় একটু ভেবে বলে, কেউ ভাংচি দিয়েছে কিনা দেখুন।

হুঁ—আমিও ছাড়ছি নে। চল থানায়।

সুখময় বিস্মিত হয়ে বলে, থানায় কি হবে?

মধুসূদনের কাছে—

সুখময় বলে, এই দেখুন—মশা মারতে কামান দাগা বলে একে। দারোগা-পুলিস না করে গাঁয়ের দশজনের সামনে আচ্ছা করে দুটো দাবড়ি দিয়ে দিন যার উপর আপনার সন্দেহ হয়।

সন্দেহ কাকে করি, কেউ আমার শত্রু নয়—

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভিজে ওঠে। বললেন, কারো কোন ক্ষতি করি নি জীবনে—কেন যে লোকে পিছনে লাগে! থানায় যাচ্ছি বাবা এজাহার দিতে নয়। মরে গেলেও ওসব তালে যাব না। খুব এক ভাল সম্বন্ধ—কাল মধুসূদন খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

সম্বন্ধ আগরহাটি কন্‌সার্নের নায়েব পশুপতি চক্রবর্তীর সঙ্গে। পদবী নায়েব বটে, আসলে ম্যানেজার সে-ই। বুদ্ধিমান কর্মঠ যুবা, হেলির অত্যন্ত

প্রিয়। জয়রামপুরে চলে আসবার সময় হেলি তারই উপর ওখানকার ভার দিয়ে এসেছে। ইণ্ডিগো-কোম্পানির ডিরেক্টররা এখনো ইতস্তত করছেন দেশী লোককে পুরোপুরি ম্যানেজারের পদে বসাতে। সেই জন্য নায়েব নামে সে বহাল হয়েছে। কিন্তু দিন দিন অবস্থা যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে. তাতে সাহেবরা এ-ও ভাবছেন, অতঃপর নিজেরা পিছনে থেকে দেশী লোকদের কর্তা করে সামনে বসাবেন কি না? গণ্ডগোল বাধে তো ওরা নিজেরা মাথা ফাটাফাটি করে মরবে, কুঠিয়ালের গায়ে আঁচড় পড়বে না। এই রকম নানা বিবেচনায় হেলির জায়গায় নূতন কাউকে আনা হয় নি, পশুপতিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিখুঁত ভাবে চালাচ্ছে, হেলির চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়।

সাহেবসুবোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পশুপতির চেহারাও খুলেছে প্রায় তাদের মতো। সুখময়ের তো চোখে পলক পড়ে না, বলে, আর ঘোরাঘুরি নয় খুড়োমশায়, এইখানেই লাগাতে হবে। জোর কপাল দুর্গার, এদ্দিন তাই তার বিয়ে হয়ে যায় নি। লাখে একটা মেলে না এমন পাত্র।

রূপ ও স্বাস্থ্য শুধু নয়—বিদ্যাও অগাধ। সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে অনর্গল ইংরেজী বলে যেতে পারে। মধুসূদন দারোগা শত কণ্ঠে সেই সব গল্প করতে লাগলেন। বললেন, ওদের বাসায় চলুন ঠাকুর মশায়, জুত করে আলাপ-সালাপ করবেন। তখন বুঝবেন, বাড়িয়ে বলেছি কিনা আমি। বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ-মুখ দিয়ে। আপনাকে কষ্ট দিয়ে এতদূর কি অমনি অমনি নিয়ে এলাম?

বাসায় গিয়ে চাক্ষুষ পরিচয়ের পর পীতাম্বর কোন ক্রমে আর ভরসা রাখতে পারেন না। সুখময়কে বলেন, কত হেঁকে বসবে তার ঠিক কি? হেলি সাহায্য করবে বলেছে—কিন্তু আমি তো আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলতে

পারি নে তাকে। তোর সমবয়সী আছে—হাসি-মস্করার ভিতর দিয়ে দেখ দিকি ছোকরাকে একটুখানি বাজিয়ে।

পশুপতির সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে তিনি বাইরে গিয়ে বসলেন। বসে স্থির থাকতে পারেন না, চোখ ইসারায় সুখময়কে ডেকে আবার বলে দিলেন, চেষ্টা করে দেখ্ তুই। না হয় ঘর-বাড়ি জায়গা-জমি যা কিছু আছে, বিক্রি করে দেব। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেলে আর আমার দায়টা কিসের? এমন ছেলের জন্য দু-পাঁচ শ বেশি যদি যায়, সে টাকা জলে পড়বে না।

ঘরের ভিতর সুখময় পশুপতির সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। পীতাম্বর বারাণ্ডায় বসে স্বভাবের শোভা দেখছেন, আর উৎকর্ণ হয়ে আছেন ওদের প্রতিটি কথা শোনবার জন্য।

সুখময় পশুপতির হাত জড়িয়ে ধরল। পশুপতি রাঙা হয়ে ওঠে।

ছিঃ-ছিঃ! অমন করে বলছেন কেন? এক সময় টোল ছিল আমাদের দেশের বাড়িতে, আমার বড় ঠাকুরদা সারাজীবন টোলে পড়িয়ে গেছেন, শিক্ষা-ব্রতীর সম্মান আমরা জানি। বড়লোকের বাবু-মেয়ের চেয়ে শিক্ষকের হাতে-গড়া মেয়ে সংসারে বেশি সুখশান্তি আনবে। বুঝিয়ে বলতে হবে না আমায় কিছু।

মেয়ের রং একটু চাপা শুনে পশুপতি জবাব দিল, আহা সোজাসুজি বলুন না কেন—কালো মেয়ে। তাতে সঙ্কোচের কি আছে? কালো মেয়ের বিয়ে হবে না—পড়ে থাকে নাকি? আমার মতো রাঙা-মূলোগুলোই বুঝি কেবল মানুষ—রং ময়লা হলে মানুষ বলবেন না তাদের? দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি—আমায় কিছু বলতে হবে না। মাকে আপনারা ভাল করে বলুন। তা হলে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

তারপর খুড়ো-ভাইপোয় আবার যুক্তি-পরামর্শ হল। সুখময় এদিক-ওদিক

তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, আমার মনে হচ্ছে খুড়ো মশায়, হেলির টিপ রঁয়েছে পিছনে। মধু-দারোগাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তো। নইলে একেবারে গঙ্গাজল—কথা না পড়তে হাঁ-হাঁ করে উঠছে—পিছনের চাপাচাপি না থাকলে এমনটা হয় না!

পীতাম্বর অতিমাত্রায় চটে উঠলেন।

তোদের পাপ-মন—সব জিনিসের পিছনে উদ্দেশ্য খুঁজিস।

পশুপতির মা'র কাছে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে তিনি একেবারে বেহান বলে ডেকে বসলেন। বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা—তবু ঠিক সামনে এলেন না, কপাটের আড়াল থেকে কথাবার্তা চলতে লাগল। পীতাম্বর বললেন, মেয়েটার মা নেই, আপনাকে মেয়ে বলে নিতেই হবে বেহান ঠাকরুণ—

হেসে রসিকতার ভাবে আবার বললেন, পাদপদ্মে এনে রেখে যাব। কেমন তুলে না নেন দেখব।

বেহান কিন্তু ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হলেন না, সকল রকম খবর নিলেন। নীলকুঠির সঙ্গে পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। শুনে একটুখানি কি ভাবলেন। বললেন, মেয়ের জন্য আটকাবে না। পশুপতি আমার ফরশা আছে, ছেলেপিলে হতকুচ্ছিৎ হবে না। গহনা-বরশয্যাও যা আপনার সাধ্যে কুলোয় দেবেন—

আনন্দে পীতাম্বরের বাকরোধ হয়ে আসছে। সত্যযুগের মানুষদের সামনে এসে পড়েছেন নাকি দৈবাৎ?

একটুখানি কিন্তু গোলযোগ আছে পণ্ডিত মশায়, আগে ভাগে খুলে বলা উচিত। আমরা শ্রোত্রিয়, আপনার কুল ভেঙে যাবে। রাজী আছেন? সাত পাক ঘুরে গেলে চোদ্দ পাকেও আর তা খুলবে না। ভাল করে ভেবে

চিন্তে দেখুন বাড়ি গিয়ে। আমাদেরও তো শুধু দারোগাবাবুর মুখে শোনা— আর-কিছু খবরাখবর নিই—

প্রচুর আদর-আপ্যায়ন হল। গুরুভোজনের পর বিছানায় গড়াতে গড়াতে সুখময় বলল, কি ঠিক করলেন খুড়োমশায় ?

তাই ভাবছি বাবা।

আর যা ভাববার ভাবুন, কিন্তু ছেলে নেই—কুলের ভাবনা ভাবতে যাবেন কার জন্ম ? মেয়ে ভাল থাকবে, তা হলেই হল। এমন পাত্র কদাচ হাতছাড়া হতে দেবেন না।

বটেই তো! বলে পীতাম্বর চুপ করলেন। আবার বললেন, বুঝলি সুখময়, বাড়ি গিয়ে বউমাকে লাগাতে হবে, তিনি যেন দুগ্‌গার সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে—তার ইচ্ছেটাও শোনা উচিত। বিয়ে নিয়ে ওর মায়ের খুঁতখুঁতানি ছিল। সে নেই—এখন একলা আমি ঝাঁ করে কিছু করে বসতে ভরসা পাই নে। বউমাকে বলবি, বেশ কায়দা করে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

যাবার মুখে ঝি আর এক দফা পান এনে দিল। ঘরের ভিতর থেকে পশুপতির মা বললেন, মা-লক্ষ্মীকে তো এইখানে এনে দেখিয়ে যেতে হবে। মেয়েমানুষ আমি—আপনাদের ওখানে যেতে পারব না তো!

পীতাম্বর বিরক্ত হলেন এ প্রস্তাবে। তবু মেয়ের বাবা। হাসিমুখে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, মা-লক্ষ্মীও তো মেয়ে বেহান ঠাকরুন। এদ্দূর তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে ?

পশুপতির মা দৃঢ় কণ্ঠে পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, মেয়ে চোখে না দেখা পর্যন্ত পাকা-কথা দেওয়া যাচ্ছে না। মাঘ মাসে কাজ করতে চান তো দু-দশ দিনের মধ্যে মেয়ে-দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

সুখময় বকবক করে পাত্রের গুণপনা এবং পাত্রপক্ষের আপ্যায়নের প্রশংসা করছে, পীতাম্বর চুপচাপ আগে আগে চলেছেন। বরাবর সদর রাস্তা ধরে যাবার কথা—তা ডাইনে নদীর ঘাটে এসে তিনি মাঝির দরদস্তুর করতে লাগলেন।

সুখময় বলে, আবার কোথা?

চিনেটোলায় একটা খবর কাছে।

এটার কি হল?

নিরাসক্তভাবে পীতাম্বর বললেন, এটা তো রয়েছেই—

সুখময় বিরক্ত হয়ে বলে, একনাগাড় পাত্র ঠিক করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ে সাকুল্যে একটা।

পীতাম্বর বললেন, আজ অবধি যত পাত্র দেখেছি—একুন করলে দেড় কুড়ি পৌণে-দু'কুড়ি পৌছয়। ক'টা তার মধ্যে গেঁথেছে বল দিকি বাবা? পোড়া অদৃষ্টে শেষ অবধি সমস্ত ফসকে যায়। সাধ করে কি এদেশ ওদেশ ঘোড়দৌড় করে মরি?

একটু থেমে আবার বললেন, শ্রোত্রিয়ের ঘরে না হয় কাজ করলাম, কিন্তু আবদার শুনলে তো, মেয়ে তুলে এনে ওঁদের দেখিয়ে যেতে হবে। দুগ্‌গাও তার মায়ের মতো—শুনে যদি একবার বেঁকে বসে, খুন করে ফেললেও এক পা নড়ানো যাবে না। মুশকিল আমার সকল দিকে।

চিনেটোলায় পৌছতে রাত্রি হয়ে গেল। পাত্রের বাপের তালুক আছে, সাতশ' সাতান্ন টাকা সেস দেয়। বাড়ি-ঘরদোরও ভাল। কিন্তু ছেলে কাজকর্ম কিছু করে না। একেবারে কিছু করে না, তা নয়—তবলা বাজায়, আর এক টাট্টু ঘোড়া আছে, তার খেজমত করে। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় এগ্রাম-সেগ্রাম।

পীতাম্বর সুখময়কে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন রে?

ভালোই তো মনে হয়—

যা দেখিস, সবই তোর কাছে ভালো। শুনলি তো, ছেলে কিছু করে না—

সুখময় বলে, করে বই কি! ঘোড়া ছুটোয়, তবলায় তেহাই দেয়। আর কিছু করতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমাদের বাপের তালুক থাকলে আমরাও করতাম না ওর বেশি কিছু।

পীতাম্বর তবু ইতস্তত করছেন দেখে বলল, চোখ বুঁজে পাকা-কথা ফেলে বাড়ি চলুন। এরাও কিছু কম যায় না—মেয়ে দেখে পছন্দ করলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দেবেন। বেশি খুঁতখুঁত করেই তো মুশকিল বাধাচ্ছেন। বেশি যে বাছে, তার শাকে পোকা বেরোয়।

দু'-দু' জায়গায় কথাবার্তা বলে অনেকটা সুস্থির হয়ে পীতাম্বর বাড়ি ফিরলেন। সুখময়কে পই-পই করে সামাল করে দেন, কোন রকম উচ্চবাচ্য না হয় এ নিয়ে।

চিনেটোলার কুটুম্বরা আসছেন, বিশেষ রকম হাট-বাজার করবার দরকার। সন্ধ্যার পর হাট যে সময় ভাঙো-ভাঙো, পাড়ার সকলের চোখ বাঁচিয়ে খুড়ো-ভাইপো চুপিচুপি হাটে চললেন।

কুটুম্বরা দু-জন আসছেন। অন্ধকারে পথের আন্দাজ পাচ্ছেন না—ডেকে সাড়া নিচ্ছেন, পীতাম্বর চাটুজ্জে মশায়ের বাড়িটা কোন্ দিকে?

কাঁঠালতলার দিক থেকে দ্রুতপদে একজন চলে এল। খাতির করে বলে, পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি যাবেন? চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

যেতে যেতে বলে; মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন বুঝি? তা এদ্দূর এসেছেন যখন দেখে যাবেন বই কি! নিশ্চয় দেখবেন।

পাত্রের বাপ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন? কেন?

গ্রামের কুমারী মেয়ে—বলা আমার উচিত হবে না। পণ্ডিত মশায় আহ্বান করে এনেছেন, ধরতে গেলে গ্রামেরই অতিথি আপনারা।

বউ করে ঘরে তুলতে যাচ্ছি, খবরাখবর জানব না? বলতেই হবে মশায়—

অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে লোকটি বলল, মেয়ের গায়ে শ্বেতি আছে। তা আবার আপনারা দেখতেও পাবেন না, হাঁটুর উপরটায় কিনা! গ্রামের মেয়ে বলে ছোটবেলা থেকে আমরা জানি। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

প্রবীণ ভদ্রলোকটি এবারে তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। থামবেন না মশায়, সমস্ত খুলে বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত বলতেই হল। দুগ্‌গার মাখামাখি আছে গ্রামের কেশব নামক এক ছোকরার সঙ্গে।

শুনে ভদ্রলোকেরা থমকে দাঁড়ালেন। লাল ভেরেণ্ডার বেড়ায় ঘেরা বাড়ি সামনে। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, চলে যান—ঐ যে আলো জ্বলছে।

চলেই যাব। অনেক ঘুর-পথে এসেছি। পাথরঘাটা পৌছবার সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেন যদি দয়া করে—

সে কি, রাত্তিরবেলা যাবেন কোথা? গ্রামের অপমান যে তা হলে। পণ্ডিত মশায়ের মনে কি রকমটা হবে, ভাবুন দিকি?

খুড়ো-ভাইপো ঠিক সেই সময়টা হাটবেসাতি করে ফিরছেন!

কারা?

ভদ্রলোকেরা উত্তর দিলেন, বিদেশী মানুষ। পাথরঘাটায় যাব, আমাদের পানসি আছে সেখানে।

পীতাম্বর কাছে এসে দেখে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন। আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়। ওরে সুখময়, দৌড়ে আলো এনে হুড়কোর কাছে ধর্—

মাপ করবেন। এই জোয়ারে ফিরে যেতে হবে।

স্তম্ভিত পীতাম্বর প্রশ্ন করলেন, কেন? করজোড়ে তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ালেন। দোষটা কি হয়েছে বলে যেতে হবে—

জোচ্চুরি করে শ্বেতিওয়ালা মেয়ে গছাতে যাচ্ছিলেন—

কিন্তু পাত্রের বাপ প্রবীণ ভদ্রলোকটি ধমক দিয়ে মুখফোঁড় সহগামীর কথা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, কিছু নয় চাটুজ্জে মশায়। কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে বলে আমরা কি জন্য নিমিত্তের ভাগী হতে যাব? আপনাদের গ্রামের লোক উনিই বলবেন—

পিছন ফিরে দেখলেন, লোকটি ইতিমধ্যে সরে পড়েছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাত দুপুরের মতো নির্জন নিস্তব্ধ গ্রাম। কেশব সেই সময় চাষা-পাড়া থেকে বাড়ি ফিরল। পুকুর-ঘাটে খেজুর-গুড়িতে পা ঘষে ঘষে কাদা ধুল। উঠানে এসে হাঁক পাড়ল, পিশিমা—

দূর-সম্পর্কীয় এক পিশি তার বাড়ি থাকেন। তিনি রাঁধাবাড়া করে দেন। তেলের ভাঁড় নিয়ে পিশি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কেশব বলে, ভাত বেড়ে ফেল পিশিমা—

খানিকটা তেল মাথায় থাবড়ে গামছা ও খড়মজোড়া নিয়ে আবার পুকুরে গেল। গোটা কয়েক ডুব দিয়ে গা মুছে গামছা পরে পরনের কাপড়টা কেচে নিয়ে খড়ম পায়ে দিতে যাচ্ছে, দুর্গা কোন্ দিক দিয়ে ঝড়ের মতো এসে পায়ের আঘাতে খড়ম একগাছা ছুঁড়ে দিল ঘাটের দিকে।

কেশব মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে।

খড়ম ফেললে কেন ?

মারা উচিত ছিল। সেটা যে পেরে উঠলাম না।

বলতে বলতে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দুর্গার কপোল বেয়ে। কেশবের যে রাগ হয়েছিল তা ঐ সঙ্গে জল হয়ে গেল।

ব্যাপার কি ?

জান না ?

আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টিতে দুর্গা তার দিকে তাকাল। কেশব চঞ্চল হয়ে ওঠে, দৃষ্টি যেন দগ্ধ করছে তাকে।

আমি জানি। তাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে এসেছি, ওসব করে লাভ কিছু হবে না।

কেশবের কণ্ঠস্বর সহসা কাতর হয়ে উঠল।

কিসে লাভ হবে, সেটাও বলে যাও তা হলে।

এ জন্মে হবে না। শত্রুতায় হবে না, কেঁদে-ককিয়েও নয়। মিথ্যুক শঠ কোথাকার! ঘেন্না করি তোমাকে। বাবাকে এখনো বলি নি, বললে তোমায় খুন করে ফেলবেন।

এত গালিগালাজ কেশবের কানেই যাচ্ছে না যেন। বরঞ্চ হাসির আভা মুখে। বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। কে মিথ্যে করে আমার নামে কি বলেছে।

কেউ বলে নি, জানবে কে ? সাক্ষি রেখে করবার মতো কাঁচা লোক কি তুমি ?

কেশব হেসে বলে, সেইটে মনে রেখো—কাঁচা লোক আমি নই। যা করছি আর যা করব, একজনও তার সাক্ষি থাকবে না।

কেমন এক রহস্যপূর্ণ ভাবে কেশব তাকায়। এ দৃষ্টি আজকালই তার

চোখে দেখতে পাচ্ছে। দুর্গা দু'টি চোখের স্বচ্ছ আয়নায় চিরদিনের চেনা গুড়ুকখোর নিরেট-মস্তিষ্ক কেশবের নূতন মূর্তি দেখে।

সারা অঞ্চলে গোলমাল। নীলচাষের ভয়ে চাষীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। পাগলা টুইডির জয়রামপুর—এ গ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। পালাবার নাম কেউ মুখে আনে না এখানে। ইণ্ডিগো কোম্পানি গ্রামের পত্তনিদার—তার উপর টুইডি যাকে যা দিয়েছিলেন, দীর্ঘকাল পরে হেলির আমলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত সমস্ত টাকার সুখত দিতে হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও কালবৈশাখীর ঝড়ে এবার যখন চালের পচা ছাউনি উড়ে গেল, আর হুঁশ হল—খোরাকি ধান আউড়ির তলায় এসে ঠেকেছে, নির্লজ্জ চাষীরা তখন আবার দলে দলে নীলকুঠিতে গিয়ে হাত পাততে লাগল। হেলি বিমুখ করল না কাউকে—নীলের জন্য দাদন নিচ্ছে, এই মর্মে চুক্তিপত্র লিখিয়ে আবার টাকা দিল। পাঁচ আনা মন হিসাবে দাম কেটে নিয়ে পরিমাণ মতো নীলের বীজও দিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। সদরে প্লান্টার্স ক্লাবে হেলি দেমাক করে বলে এল, আর যেখানে যা-ই হোক, তার এলাকায় চাষ অনেক বেশি হবে অন্যান্য বৎসরের তুলনায়। সত্যিই চাষ ভাল এবার—গোণ পেয়ে চাষীরা বিষম খাটছে। হেলি মাঝে মাঝে মাঠে গিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাষ দেখে।

চাষ হল, বীজ ছড়াল, অঙ্কুরোদ্গম হল—আরে আরে, কি সর্বনাশ! নীল তো নয়, আউশধান।

গেঁয়ো চাষীর এত সাহস? হেলি হেন ব্যক্তিকে ডাহা বেকুব বানিয়ে দিল! ক্লাবে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। অন্যের দুর্দশায় আনন্দ করবার মতো মনের সুখ এখন কোন কুঠিয়ালের নেই। হেলির কিন্তু নিশ্চিত ধারণা, অন্য কন্‌সার্নের লোকেরা মুখ টিপে হাসে তাকে দেখলে। যত ভাবে, ততই সে ক্ষেপে যায়। কুঠির লোক দিয়ে এক দিন ধানবনে হৈ-হল্লা করে লাঙল

দেওয়াল। কচি ধান-চারা ফলার মুখে উপড়ে নিশ্চিহ্ন হল জলে-কাদায়। কিন্তু এলাকা জুড়ে এই চালাকি করেছে, কাঁহাতক লাঙল চষে চষে জমি ভেঙে বেড়োনো যায়? ক'টাকে কয়েদখানায় পুরবে, লাঠি দিয়ে ঠেঙাবে? তাতে তো নীলের চারা গজাবে না ক্ষেতে। মরসুমটা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে গেল।

প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে দেখা গেল উলটো-উৎপত্তি ঘটছে। সাহেবের সামনে দৈবাৎ এসে পড়লে আগে যারা থরহরি কাঁপত, তারাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মুই নীল বুনব না। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, এতে তবু ইজ্জত বজায় থাকে—কিন্তু ভয় ভেঙে যারা মরীয়া হয়েছে তাদের নিয়ে উপায় কি এখন?

মধুসূদন পীতাম্বরকে বলেছিলেন, ভদ্র ঘরের মাথাওয়ালা কুলাঙ্গার কতকগুলো দলে জুটেছে। পিছন থেকে তারা উসকে দেয়। নইলে ওদের ক্ষমতা কতটুকু—দু-দিনের ভিতর ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত।

দুর্গা শুনেছে সমস্ত। মাথাওয়ালা দলের ভিতর কেশবেরও নাম বেরিয়েছে, এর চেয়ে হাস্যকর কি আছে? কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি সে। কিন্তু আজকে কেশবের সঙ্গে কথাবার্তায় সহসা তার মনে হল, বাজে গুজব বলে কোন খবর উড়িয়ে দেবার নয় এ সময়ে; কেমন যেন ভয় হতে লাগল কেশবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে।

কেশব হাসতে হাসতে বলল, গ্রামের মেয়ে—তার উপর পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে—যার তার হাতে পড়ে কষ্ট না পাও, সেইজন্য আঁকু-পাঁকু করি। নইলে আমার কি যায় আসে বল।

কিচ্ছু আসে যায় না তোমার?

না, কিচ্ছু নয়। পণ্ডিত মশায় সোজা মানুষ—যে সম্বন্ধটা আসে, তাতেই নেচে ওঠেন। ভাবেন, এমন পাত্র ভূ-ভারতে নেই।

দুর্গা বলল, সুপাত্র তুমি একলা-ই ভূ-ভারতে ?

ম্লান হেসে কেশব বলে, আমার কথা আর কেন ? আমি তো সকল বিবেচনার বাইরে। কথা দিচ্ছি দুর্গা, ভাল ছেলে আসুক—সময়ে যদি কুলোয় নিজে আমি বরের চারদিকে কনের পিঁড়ি ঘোরাব।

সময়ে যদি কুলোয়—বড় ব্যস্ত আজকাল তুমি বুঝি ?

এ প্রশ্ন কানে না নিয়ে কেশব বলতে লাগল, চিনেটোলার ছোঁড়াটাকে জানি। এক নম্বর হতচ্ছাড়া। সকল রকম নেশা করে। ভেগে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। তার জন্য দুঃখ পাওয়া কিংবা আমাকে ঘেন্না করার কোন কারণ নেই।

কিন্তু সত্যি সত্যি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। আগরহাটি যাচ্ছি বাবা আর আমি। অমন পাত্র তপস্যা করে মেলে না—সুখময়-দা ব্যাখ্যান করছিলেন।

কেশব সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে।

দুর্গা বলতে লাগল, যাচ্ছি—যদি দয়া করে পছন্দ করেন। দিন আষ্টেক আজ মুখে বেসম আর সর ঘসছি, খুব ঘষামাজা করছি—কালোর উপর যদি একটু চিকন আভা খোলে। পাত্রের কুলমর্যাদা নেই—সুখময়-দা'র বউকে দিয়ে সেই সম্বন্ধে বাবা আমার মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। আমি খুশি মনে মত দিয়েছি।

কেশব জিজ্ঞাসা করে, আগরহাটির পাত্র—কে বল দিকি ?

পশুপতি চক্রবর্তী। নিশ্চয় চেন তুমি। তোমার যা কাজ, একে না চিনে উপায় নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে কেশব বলে, চিনেছি। কুলমর্যাদা কেন, কোন মর্যাদাই নেই তার। ওর চেয়ে চিনেটোলার পাত্র ভাল। নেশা করে করে একদিন সে নিজে মরবে, কিন্তু পশুপতির মতো দেশসুদ্ধকে মেরে যাবে না।

দুর্গা সভয়ে বলে, আবার তুমি ঝাগড়া দেবে নাকি? খবরদার!

কেশব বলে, কুঠিবাড়ির পাকা-দালানে উঠবার সত্যি সাধ হয়েছে? তাই হোক—একটা কথাও আমি বলতে যাচ্ছি নে। কি দরকার? ক'দিন পরে কোন পাত্তাই হয় তো পাবে না আর আমার।

কোথায় যাবে?

কেশব হেসে উঠল।

কুঠির নায়েবের বউ হচ্ছ—কেন তোমায় সাক্ষি রাখতে যাব?

খড়ম কুড়িয়ে পায়ে পরে ধীরে ধীরে সে রান্নাঘরের দিকে চলল।

তার পরেও দুর্গা অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাগ হচ্ছে, হিংসা হচ্ছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে কেশব চিরদিনই নিচে। কত লোকে তাকে ঠাট্টা-তামাসা করেছে দুর্গার সঙ্গে তুলনা দিয়ে। আজকে কেশব তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অনেক উপরে—নাগালের বাইরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলে আজকাল উঁচু ঢঙে, যেন কত দূরের মানুষ!

শেষ রাত্রে পীতাম্বর গরুর গাড়ি নিয়ে এলেন। এসে রুখে উঠলেন মেয়ের উপর।

পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস এখনো—ঘুম আসে এ অবস্থায়?

জেগে আছি।

চুপচাপ পড়ে আছিস তবে কোন্ আক্কেলে? পায়ে মল পরেছিস কই? খোঁপা কই?

তিন-চার দিন ধরে যাবার কথাবার্তা হচ্ছে, এই প্রথম দুর্গা আপত্তি করল। ক্রন্দনোচ্ছল কণ্ঠে বলে, আমি যাব না বাবা।

পীতাম্বর ক্ষেপে উঠে বলেন, যাবি নে কিরে? সবে তো শুরু—গাঁয়ে গাঁয়ে তোকে ফিরি করে নিয়ে বেড়াব। ভেবেছিস কি?

গাড়ির চালার উপর বসে পীতাম্বর গজর-গজর করতে লাগলেন, অপমান-জ্ঞান তোরই আছে, মন বলে আমার কোন পদার্থ নেই? এক কাজ করিস, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিস একদিন। তখন আর কিছু বলব না, কোথাও নিয়ে যেতে চাইব না।

আকাশে শুকতারা দপদপ করছে, সেই সময় তারা রওনা হল। সমস্ত গ্রাম অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কেশবের নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় গভীর নিশ্বাস ফেলল দুর্গা। কোথায় চলে যাবে সে আর ক'দিন পরে! সত্যিকার আপন জন কেউ থাকলে যাবার কথা বলতে পারত কি অমন করে? যেতে কি দিত তারা?

বাসায় একলা পশুপতির মা। আজ তিনি সামনে বেরিয়ে এলেন।

এই মেয়ে?

তারপর অন্ধকার মুখে তিনি আহ্বান করলেন, এস বাছা। ওরে, বাইরের ঘরটা খুলে বসতে দে এঁদের।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজী?

বেরিয়ে গেছে। বড্ড গোলমাল।

থানার জমাদার ঐ-দিক দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ছুটে যাচ্ছিল। পশুপতির মা ডাকলেন।

বড্ড যে ঢাকের বাজনা। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। পরব-টরব নাকি, নটবর?

নটবর এই পাড়ারই—অবসর মতো এঁদের ফাইফরমাশ খেটে কিছু রোজগারও করে। কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে সে বলল, ঢাক-বাড়ি করেছে মা রসকে-মুচির গোয়াল-ঘরে। রাজ্যের ঢাকঢোল এনে জড় করেছে। কুঠির পাইক-বরকন্দাজ বেরুলে ঢাকে কাঠি পড়ে, গাঁয়ের মানুষ সামাল হয়ে যায়।

থামছে না তো মোটে! ভোরবেলা থেকে ড্যাডাং-ড্যাডাং বেজে চলেছে।

নটবর বলে, বিষম কাণ্ড আজকে। দল বেঁধে যত চাষী ঢাল-শড়কি নিয়ে রসকের উঠোনে নাচছে ঢাকের বাদ্যির তালে তালে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা সমস্ত বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পশুপতির মা বললেন, সর্বনাশ! পশুপতি আমার খানিক আগে বেরিয়ে গেল যে!

বেরুতে পারেন নি। থানা অবধি গিয়ে আটকে গেছেন। নেচে কুঁদে ওরা বাড়ি ফিরে যাবে, করবে কচু। ভয় নেই মা, সদর থেকে সিপাহি এসে পড়ল বলে, দু-দিনে সব ঠাণ্ডা করে দেবে। এই দেখ—আস্পর্ধা দেখ হারামজাদাদের—এই দেয়ালেও কি সব লিখেছে দেখ—

সবাই একসঙ্গে মুখ ফেরালেন। দেয়ালের বালির জমাটে কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কবিতা লিখেছে—

আগরহাটির লম্বা লাঠি
পশুপতির মুণ্ডু কাটি

আবার লিখেছে—

জমির শত্তুর নীল
মাছের শত্তুর চিল
পশুপতির কানডা ধরে
পিঠে মারি কিল।

ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে মানুষের কোলাহল কানে আসছে এবার। অনেক লোক মিলিত-কণ্ঠে জকার দিচ্ছে। কেঁচোর মতো নগণ্য মানুষের দল সাপ হয়ে ফণা তুলেছে। গা শিরশির করে উঠল দুর্গার। কেশব আছে কি ওর মধ্যে? এখানে না থাকলেও আছে নিশ্চয় কোন না কোনখানে রায়তদলের ভিতর। দেয়ালের লেখাগুলো—হ্যাঁ, কেশবের হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের

মতোই মনে হয়। কেশব এতদূর এই আগরহাটি এসে জুটেছে—এ অনুমান হয়তো ঠিক নয়। তবু যেখানে গণ্ডগোল, দুর্গা মনে মনে সেইখানে কেশবের অস্তিত্ব ধরে নেয়।

পীতাম্বরের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। বললেন, আপনার মন ভাল নেই বেহান। আজকে ফিরে যাওয়া যাক, কি বলেন? আপনার কনে দেখা তো একরকম হয়ে গেল। হাঙ্গামা মিটে যাক। বাবাজী এর পর যেদিন জয়রামপুরের কুঠিতে যাবেন, আমাদের বাড়িতে যান যেন একটিবার।

গরুর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে। পশুপতির মা সহসা ডেকে বললেন, মিথ্যে আশায় ঘোরাতে চাই নে পণ্ডিত মশাই—ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, পশুপতি যাবে না।

পীতাম্বর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্যামবর্ণ বলছিলেন—এ তো কালো। চুল পাকিয়ে ফেললেন, কাকে কোন রং বলে জানেন না? এই ধিঙ্গি মেয়ে—ঠানদিদির মতো দেখাবে যে আমার পশুপতির পাশে!

একবার ঢোক গিলে বললেন, বুড়ো মানুষ বার বার আসছেন, তাই খোলসা কথা বলে দিচ্ছি। হেলি সাহেব এসেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে আমার ছেলেকে করতেই হবে এ বিয়ে। আর এই কালো মেয়ে ফরশার কদরে বিকোবে, এমন সাহায্য এ দুঃসময়ে হেলি আপনাকে করতে পারবেন না। আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন পণ্ডিত মশাই।

দুর্গা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। চোখে জল টলমল করছে, ক্যাঁচকোচ আওয়াজ করে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। মেয়ের দিকে চেয়ে পীতাম্বরের মন স্নেহে গলে গেল। গায়ের রং একটু ময়লা হতে পারে, কিন্তু কি চমৎকার

দেখাচ্ছে তাকে! দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন, চোখ নেই—কানা মা-মাগিটা। ছেলের দেমাকে আমার মেয়ের দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল না।

কিন্তু যোগাযোগ এমনি, এরই দিন পাঁচেক পরে পশুপতি পায়ে হেঁটে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি উপস্থিত।

পণ্ডিতের বাড়ির দক্ষিণে বড় রাস্তার লাগোয়া প্রকাণ্ড বিল। আষাঢ় মাস—ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, অবিশ্রান্ত বেঙের ডাক। ধানবনে জল জমেছে। রাত্রি শেষ প্রহর। অভ্যাসমতো পীতাম্বর তামাক খেতে উঠেছিলেন, মানুষের আর্তনাদের মতো কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। বৃষ্টির একটানা আওয়াজের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে নিঃসন্দেহ হলেন—মানুষই। দরজার খিল খুলতে দড়াম করে দুটো কবাট দু'দিকে আছড়ে পড়ল, বাতাসে মেটে প্রদীপ নিভে গেল। বাইরে কি দুর্যোগ চলছে, দরজা না খোলা পর্যন্ত সঠিক আন্দাজ হয় নি।

জলে-কাদায় মাখামাখি—টলতে টলতে এক মূর্তি এসে ঘরে ঢুকল। আর হাঁটবার জো নেই—প্রাণের টানেই কেবল এতদূরে চলে এসেছে। এসেই মেজের উপর ধপ করে বসে পড়ল, এগিয়ে ফরাস অবধি যাবার সবুর সইল না।

কে তুমি?

অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

পিছন দিককার দরজা খুলে পীতাম্বর চেঁচামেচি করতে লাগলেন, শিগগির উঠে আয় সুখময়, শিগগির—

আবার প্রদীপ ধরিয়ে চিনতে পারা গেল। পশুপতি। কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ—আট-দশটা পানি-জোঁক সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরেছে। খানিক সামলে নিয়ে

পশুপতি দুটো-একটা কথা যা বলল—পীতাম্বর বুঝলেন, শোলা-ঝাড়ের ভিতর যে জায়গায় সে লাফিয়ে পড়েছিল, এখানে থেকে সেটা ক্রোশ দেড়েকের কম নয়। একগলা ধানবনের ভিতর দিয়ে জল-কাদা ভেঙে এই দেড় ক্রোশ পথ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন ভাবে সে চলে এসেছে। ভাগ্য ভাল যে বেঁচে আসতে পেরেছে।

খুব কাঁপিয়ে জ্বর এল। সুখময় আর পীতাম্বর দু-জনে ধরাধরি করে দোতলার ঘরে তুলে খাটের উপর তাকে শুইয়ে দিলেন। পুরো দুটো দিন একটা রাত্রি বেহুঁশ তারপর। প্রবল জ্বরে কেবল উঃ-আঃ করছে। গা এত গরম যে মনে হচ্ছে ধান রেখে দিলে খই হয়ে ফুটে উঠবে। পীতাম্বরের ভয় হল, অথচ বাইরের কাউকে কিছু বলতে ভরসা হয় না। দেশের অবস্থা আর মানুষের মতিগতি আশ্চর্য রকম বদলে গেছে। কুঠির লোকের নাম শুনলে মানুষ যেন ক্ষেপে যায়, তাদের সঙ্গে অতি-সাধারণ সামাজিকতাটুকুও সন্দেহের চক্ষে দেখে। বাষট্টি বৎসরের জীবনে পীতাম্বর স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এ সমস্ত।

ভোগ বেশি হল না, এই বাঁচোয়া। দিন চারেকের মধ্যে পশুপতির জ্বর ছেড়ে গেল। বোঝা গেল, তারও ইচ্ছা নয়—সে কোথায় আছে, জানাজানি হতে দিতে। এমন কি মধুসূদন দারোগাকেও জানাতে মানা করল। শুধু কয়েক ছত্রের এক চিঠি সুখময় একদিন চুপিচুপি তার মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে এল। এক তাজ্জব গল্প করল পশুপতি—বিচারের জন্য কোন গোপন আদালতে নাকি হাকিমেরা নথিপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রায়তদের ধরে ধরে তারা যেমন সাহেব-কুঠিয়ালদের কাছে হাজির করে, সেই রকমটা আর কি! তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পিতৃপুরুষের পুণ্যে প্রাণ নিয়ে কোন গতিকে পালিয়ে এসেছে।

বনবিষ্টুপুর কতদূর এ জায়গা থেকে?

নিকটেই—দুর্গা অবধি জানে গ্রামটার নাম। বর্ষাকালে খাল-বিল ঘুরে

যেতে কিছু বেশি সময় লাগে, শুকনার সময় সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে পথ অনেক কম।

বনবিষ্টুপুরে গিয়েছিল পশুপতি। রায়তেরা পালিয়েছে। একটা পাড়ার ঘর-বাড়ি সব পুড়ে গেছে। লোকে বলে, কুঠির বরকন্দাজেরা রাত্রিবেলা আগুন দিয়েছিল। এর অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। পশুপতি গিয়েছিল—ওখানে খাস চাষ হবে, সেই ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি কাজ শেষ করে ডিঙি নিয়ে সে সদর-কুঠিতে ফিরছিল। পাইক-বরকন্দাজদের গ্রামে মোতায়েন করে এসেছে, আমিন আছে শুধু সঙ্গে। মাঝি ছপছপ করে বৈঠা বাইছে, আর দু-জন মাল্লা গুণ টেনে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। উজান কেটে দুলে দুলে চলছে নৌকা। একটা মানুষ নেই কোন দিকে, যেন মৃতপুরী। খালের জল কলকল করে নদীতে পড়ছে, কেবল তারই আওয়াজ।

আমিনের কাছে বন্দুক—টোটা পোরা আছে। চারদিক তাকিয়ে তারপর বন্দুকের দিকে পশুপতির নজর পড়ল। বন্দুক রয়েছে, তখন ভয় কিসের? বিরক্ত হয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে, কত দেরি আর জোয়ারের? কত আর তোমরা গুণ টেনে মরবে?

এই যে—জল থমথমে হয়ে গেছে। টান ফিরবে এবার।

মানুষের গলা পাওয়া গেল এতক্ষণে। কাশবন—মানুষ দেখা যাচ্ছে না, হাঁক শোনা যায়।

নৌকো কার?

বদন সামন্ত আমার নাম। সাকিম বনবিষ্টুপুর।

ঘাটে ধর। ও-পার যাব—

পশুপতি ক্ষেপে উঠল।

ওরে আমার নবাবের নাতি! হুকুম ঝাড়ছেন, ঘাটে ধর। কক্ষনো নয়—চালাও।

বদন মাঝি সকাতরে বলে, এই আমাদের রেওয়াজ হুজুর, পারে যেতে চাইলে 'না' বলবার নিয়ম নেই। আর এ অঞ্চলের এরা লোক সুবিধের নয়। হামেশা চলাচল করতে হয়, এদের চটিয়ে রাখতে সাহস পাই নে।

পশুপতি বলে, করবে কি, আমি তো রয়েছি—

আপনি আজকে রয়েছেন হুজুর, কতক্ষণ আর থাকবেন! তার পরে?

সমস্ত ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—রোসো। তোমার গ্রামের ব্যাপার দেখলে তো? এখন ঐ চলল—অমনি হবে সব জায়গায়।

কিন্তু পশুপতির কথা কানে নিল না মাঝি—কাশবন ছাড়িয়ে ডিঙি কূলের কাছাকাছি যেতে হুড়মুড় করে জন পাঁচেক লাফিয়ে উঠল।

রুক্ষ স্বরে পশুপতি বলে, নৌকা ডুবিয়ে দিবি নাকি রে তোরা? আমিনের বন্দুকের দিকে সে তাকাল আর একবার।

আগন্তুকদলের অগ্রবর্তী লোকটি অতিশয় বিনয়ী। হাতজোড় করে সে বলল, দেওয়ানজি নাকি? আমরা নেংড়ের হাটখোলায় যাচ্ছি। এইটুকুন গিয়ে নেমে যাব। ক'খানা বোঠে আছে তোমার মাঝি? দাও—হাতে হাতে বেয়ে তাড়াতাড়ি হুজুরকে পৌঁছে দিই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ছইয়ের উপরে-রাখা আর তিনটে বোঠে ও দু-খানা লগি তারা তুলে নিল। বাইছে। মুহূর্ত পরে বিষম কাণ্ড। লগি ফেলে দু-জনে জাপটে ধরল বন্দুকধারী আমিনকে। বন্দুক কেড়ে নিল, গুণের দড়ি কেটে দিল। নৌকা গাঙের মাঝখানে। একজন পাঁঠা-কাটা মেলতুক নিয়ে এসেছিল দেখা যাচ্ছে গায়ের চাদরের নিচে। সে সেই মেলতুক ঘোরাতে লাগল, আমিন আর বদর মাঝির মাথার উপরে।

নাম্, নেমে পড়্ এক্ষুনি, নইলে কেটে কুচি-কুচি করব।

গোপন যোগসাজশ ছিল বলে পশুপতির সন্দেহ। বদন মাঝি এবং তারপর আমিনও ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ল নদীতে। জোয়ার এসেছে, মাঝির জায়গায় ওদেরই একজন বোঠে ধরে বসেছে। খরস্রোতে পাক খেয়ে ডিঙি খালের ভিতর গিয়ে উঠল।

সেই বিনয়ী লোকটা বলল, মিছে চেঁচাচ্ছেন হুজুর, গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ এদিকে আসবে না।

অপর একজন মন্তব্য করল, আর এলেও বাঁচাতে আসবে না তো? উল্টে দুটো চড়-চাপড় দিয়ে কি অকথা-কুকথা বলে অপমান করে বসবে। কাজ কি—চুপচাপ থাকুন।

নিরুপায় পশুপতি প্রশ্ন করে, কি চাও তোমরা?

চার বোঠের তাড়নায় ডিঙি যেন উড়ে চলেছে। কেউ জবাব দিল না। নিবিড় অন্ধকার, আকাশ-ভরা কালো মেঘ।

কাতর কণ্ঠে পশুপতি বলে, আমার কি দোষ ভাইসব? চাকরি করি—উপরওয়ালার হুকুমে সব করতে হয়।

গ্রাম জ্বালাতে হয়? গৃহস্থর মেয়ে-বউ পথে তুলে দিতে হয়? উপর-ওয়ালারাও রেহাই পাবে না। এখনো বাগে পাই নি তাই। মহারানীর স্বজাতি বলে বাঁচতে পারবে না।

আবার একসময় পশুপতি বলে উঠল, ছেড়ে দাও আমায়—

ছাড়বার এখতিয়ার নেই। পঞ্চায়েতে বিচার হবে। ছেড়ে দেবেন কি দেবেন না—তাঁরাই ঠিক করবেন বিচারের পর। আমাদের গ্রেপ্তার করে পৌঁছে দেবার হুকুম, তাই করছি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। কম্বলে মাথা রেখে পশুপতি শুয়ে ছিল। ঘুমোবার

মতো ভাব। হঠাৎ উঠে খালের পাড়ে লাফিয়ে পড়ল। সে-ও লোক সোজা নয়—নইলে কম বয়সে এত উন্নতি করতে পারত না সাহেবি কনসারনে। এই এক চালাকি খেলল ওদের উপর। ভেবেছিল, শোলার ঝাড়ের ভিতর শুকনো ডাঙায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু জল সেখানেও—জুতা-জামাসুদ্ধ জলে পড়ে গেল। তবু সুবিধে হল—দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানবন চারিদিকে। মাথা নিচু করে এঁকে বেঁকে ধানবন দিয়ে চললে দিন দুপুরেই খুঁজে পাওয়া যায় না—এ তো অন্ধকার রাত্রি। জলের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে তবে পশুপতি গ্রাম পেয়েছে। ভাগ্যক্রমে পীতাম্বর পণ্ডিতের বাড়ি এসে গেছে।

অন্নপথ্য সাত দিনের দিন। সকালবেলা দুর্গা বাটিতে করে গরম দুধ নিয়ে এসেছে। পশুপতি মুখ ভার করে বলে, আমি খাব না।

দুর্গা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়। পশুপতি যত সুস্থ হচ্ছে, ততই যেন ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশুপতি বলল, অসুখে অচৈতন্য ছিলাম—যা মুখে দিয়েছ, খেয়েছি। তোমার ঘৃণার দেওয়া এই সব এখন আর খেতে যাব কেন?

দুর্গা ভালমন্দ কিছু বলে না, যেন সে বুঝতেই পারছে না তার কথা।

পশুপতি বলতে লাগল, নানারকম রটনা হচ্ছে আমার নামে। আমি নাকি মাথা হয়ে দাঁড়িয়েছি ওদের কনসারনের, যা বলি হেলি তাতেই ঘাড় নাড়ে। রায়তেরা পেরে উঠলে চিঁড়ের মতো আমায় দাঁতে পিশে ফেলত। সবাই ঘৃণা করে। তোমরাও ভাবো ঐ রকম নিশ্চয়। নিতান্ত ঘাড়ে এসে পড়েছি, ফেলতে পারছ না—কি করবে? কিন্তু একটা কথা বলি দুর্গা—

প্রতিবাদ প্রত্যাশা করেছিল দুর্গার কাছ থেকে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে কৈফিয়তের সুরে পশুপতি বলতে লাগল, ব্যাপার হল—আমার উন্নতি

দেখে সকলের চোখ টাটায়। সাহেবি কনসারনের ম্যানেজার হতে যাচ্ছি—ধর, এতদিনের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। জাতসুদ্ধ এতে খুসি হওয়া উচিত—তা নয়, এ পোড়া দেশে পিছনে লাগতে আসে। কি করছে এরা বল তো? কোম্পানির রাজ্যে থেকে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া? লাঠি-সড়কি সমস্ত বন্দুকের গুলিতে ঠাণ্ডা করে দেবে। সদরে নালিশ করেই বা করবে কি, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি—ভাই-ব্রাদার ওরা সব। জাত-ভাইয়ের স্বার্থ না দেখে তারা কি রায়তের পক্ষে রায় দিতে যাবে?

এত কথার একটিও কানে যাচ্ছিল না দুর্গার। ঘৃণা করে বলে পশুপতি অনুযোগ জানাল, সেইটাই শুধু মনের মধ্যে বারম্বার আনাগোনা করছে। কেশবকে একদিন সে-ই বলেছিল এমনি ঘৃণা করবার কথা। দুর্গার চোখে জল এসে পড়ে। কথার মাঝখানে সে বলে উঠল, ঘৃণা আমি করি না। মিথ্যে কথা। আপনাকে না, কাউকে না। গর্ব করবার কি আছে যে অন্যকে ঘৃণা করতে যাব?

পশুপতি সামনে বসে, কিন্তু বলছে যেন অনেক দূরের আর কাকে উদ্দেশ্য করে।

পশুপতির মুখ হাসিতে ভরে গেল। বলে, সে জানি। এই কথাটাই শুনতে চাচ্ছিলাম তোমার মুখ দিয়ে। ঘৃণা থাকলে এমন দরদ দিয়ে কেউ সেবা করতে পারে? মাকে বাদ দিলে এই বাড়ির তোমরাই শুধু সত্যি সত্যি আমায় ভালবাস। এত বড় কনসারনের এলাকায় এই একটামাত্র জায়গা আমার কাছে সকলের চেয়ে নিরাপদ। কুঠির মাইনে-খাওয়া লোকজনকেও প্রাণ খুলে এমন বিশ্বাস করতে পারি নে।

তক্তাপোশের প্রান্ত দেখিয়ে বলে, বোসো দুর্গা—ঘৃণা কর না যখন, বোসো এই—এখানে।

দুর্গা বসে পড়ল।

কথা বল একটা-কিছু। শুয়ে পড়ে আছি। দিনরাত কাজকর্মে হৈ-হল্লার মধ্যে থাকা অভ্যাস—বড্ড কষ্ট হয় চুপচাপ থাকতে।

ক্ষীণকণ্ঠে দুর্গা বলে, কি কথা বলব ?

সেটা আমি শিখিয়ে দেব ?

স্পষ্ট অভিমানের সুর পশুপতির কণ্ঠে। বলে, যাকগে—কষ্ট করতে হবে না তোমার। আমিই বলছি কথা। কথা না বলে বলে মরে যাচ্ছি এই ক'দিন।

বলতে লাগল তার দুর্দৈবের কথা। রেখে ঢেকে বাইরে যতটুকু বলা যায় এই মেয়েটির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য। একেবারে নির্দোষ তার উপর নির্মম ষড়যন্ত্রের মনগড়া একটা কাহিনী সে বলে যেতে লাগল।

হঠাৎ দেখে দুর্গা ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে। পশুপতি চুপ করল।

বলুন—

তুমি শুনছ না, মিছে বকে মরছি।

শুনছি।

গলার স্বর অস্বাভাবিক মনে হল পশুপতির কাছে। রোগী এখনো সে—এক কাণ্ড করে বসল—হাত বাড়িয়ে হঠাৎ দুর্গার মুখ ফেরাল তার দিকে। ঝরঝর করে দুর্গার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আর সে গোপন করল না, ঘনপক্ষ্ম সজল দু'টি চোখ তুলে নিঃশব্দে বসে রইল।

ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে পশুপতি বলে, মা কি-সব বলেছেন শুনেছি। কিন্তু সে জন্য আমায় দোষী কোরো না, আমার উপর বিরূপ হোয়ো না দুর্গা। নিয়তি অসহায় অবস্থায় তোমাদের আশ্রয়ে এনে ফেলেছে। তাই এত কথা মুখ ফুটে বলতে পারছি। তোমায় না পেলে জীবন আমার নিষ্ফল হয়ে যাবে।

দুর্গার বুকের ভিতর কাঁপে। কি করে বলে ফেলল, সে জানে না—বলল, আমি কালো-কুৎসিত—

কালো হতে পার—হাঁ, কালো নিশ্চয়ই, কিন্তু কুৎসিত কখনো নও। কুৎসিত কেউ এমনি করে মন বাঁধতে পারে? কাল সারারাত তোমার কথা ভেবেছি, সারারাত ঘুমোই নি। এর পরেও মা আপত্তি করলে আমাকে অরাধ্যপনা করতে হবে।

তারপর হেসে উঠে বলল, তার দরকার হবে না। তোমরা আমার জীবন দিয়েছ। আমি জানি—খুশি হয়েই মা মত দেবেন।

চলে যাবার দিন পশুপতি সুখময়কে বলে গেল, পাকা-দেখা দেখতে আসবে এই মাসের মধ্যেই। মধুসূদনবাবু আসবেন, আশীর্বাদ যা পাঠাবার—মা তাঁর হাত দিয়ে পাঠাবেন।

হেসে বলে, হেলি কি ছাড়বে? সে-ও এসে তার মামার মতো গ্যাঁট হয়ে ফরাশে চেপে বসবে। এসব কাজে তার উৎসাহ খুব—

কথা রাখল পশুপতি। মাসের ভিতরেই মধুসূদন দারোগা এসে পড়লেন। পশুপতি নিজেও আছে। হেলি এসে জুটল দলে। আরও বিস্তর লোক, বিষম সমারোহ। এসে পৌঁচেছে শেষ রাতে, এখন অবধি পীতাম্বরের বাড়ি আসবার ফুরসৎ হয় নি! উত্তরপাড়ায় আছে। খবর পাঠিয়েছে—সন্ধ্যার দিকে আসবে, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকে যেন দু-তিন জনের মতো। রাতটুকু এবাড়িতে থেকেও যেতে পারে, জানিয়ে দিয়েছে।

বিষম কাণ্ড উত্তরপাড়ায়, ভয়ানক দাঙ্গা। কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য করে তুলেছে ও-পাড়ার বাড়িঘর—মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সকলে মরিয়া। প্রথম মহড়ায় সড়কি এসে বেঁধে মধুসূদন দারোগার পায়ে। ধরাধরি করে নৌকোয়,

তুলে তাঁকে সদরে পাঠিয়েছে। অতঃপর ক্ষেপে গেল থানার পুলিশ আর কুঠির বরকন্দাজের দল। খবর পেয়ে ও-পক্ষেও আশেপাশের গ্রাম থেকে পিঁপড়ের সারের মতো অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে। হঠবার পাত্র কেউ নয়—লড়াই দস্তুরমতো। খবর পাওয়া গেছে, ঐ যে পঞ্চায়েত-আদালতের কথা শোনা যায়, সে আদালত নাকি কেশবেরই বাড়িতে। কিন্তু সে অবধি পৌঁছবে, সাধ্য কার? বল্লম হাতে বটগাছে চড়ে কেশব নিজে বিপক্ষদলের গতিবিধি দেখছে, আর সেখান থেকে উৎসাহ দিচ্ছে রায়তদের।

দুর্গা ব্যাকুল হয়ে ঘর-বাহির করছে। নানা খবর আসছে মুহুর্মুহু। টোটার বন্দুক চালাচ্ছে হেলি এইবার। বিকালবেলা শোনা গেল, রণ-জয় হয়েছে হেলির, গুলি খেয়ে কেশব মারা গেছে। মাতব্বর রায়তদের ধরে তালা-চাবি দিয়ে রেখেছে, কেশবেরই শোবার ঘরের ভিতর। যে বাড়ি থেকে যার যে জিনিস ইচ্ছা, টেনে নিয়ে ফেলছে, ছড়াচ্ছে, ভাঙছে—কিছুমাত্র বাধা নেই। নানারকম গুজব জনতার মুখে মুখে—রাত্রি হলে নাকি আরও নানাবিধ কাণ্ড হবে। সমস্ত গ্রামে আর যে ক'জন পুরুষ আছে, তাদেরও নিয়ে আটকাবে। তারপর নিঃসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে···এসব অবশ্য অনুমানের কথা। কিন্তু নৃশংসতার নমুনা দেখে সত্যি এবার ভয় পেয়ে গেছে জয়রামপুরের মানুষজন।

এরই মধ্যে একটু আনন্দের খবর একজনে দিয়ে গেল। কেশবের মৃতদেহের সন্ধান ওরা পায় নি, সুকৌশলে সরিয়ে নদীকূলে কেয়াবনে ঢুকিয়ে রেখেছে। গভীর রাত্রে চারিদিক নিশুতি হলে চুপি চুপি দাহ করবে। এত ভালবাসে তাকে সকলে, কিন্তু তার শেষকৃত্যে হরিধ্বনিও দেওয়া চলবে না একটিবার।

প্রহরখানেক রাত্রি। অতল নিস্তব্ধতা, দিনের তুমুল উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। উত্তরপাড়ার পথে পথে বল্লম হাতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সতর্ক বরকন্দাজের দল। এতক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পশুপতি পীতাম্বরের বাড়ি

এল। একা নয়—হেলি সাহেবকে নিয়ে এসেছে। আর ক'জন বরকন্দাজ এসেছে, তারা বাড়ি ঢুকল না—হুড়কোর বাইরে বকুলতলায় দাঁড়াল। ঐখান থেকে পাহারা দেবে যতক্ষণ এঁরা আছেন এখানে।

সাড়া পেয়ে পীতাম্বর বেরিয়ে এলেন। পাংশুমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। গলা কাঠ হয়ে গেছে, ভালমন্দ একটি কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

হেলি বলল, তোমার বাড়ি এলাম পণ্ডিত। অতিথি। রাতে আবার বেরুতে হবে কি-না! কাজ আছে। তাই আর কুঠি অবধি ফিরে গেলাম না।

বলে সে বাঁকাহাসি হাসল।

দুর্গাকে ডাক দিয়ে পশুপতি বলল, বড্ড কষ্ট হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। খাবার দাও।

হেলিকে দেখিয়ে বলে, আর এক ঘটি গরম জল নিয়ে এস দিকি তাড়াতাড়ি। সাহেব হাত-পা ধোবেন।

দুর্গা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়।

পীতাম্বর বিপন্ন ভাবে চুপিচুপি মেয়েকে বললেন, সত্যি যে এসে উঠল। কি করি বল্‌তো এখন?

আপনার লোক বলে জানে, তাই এসেছে—

সংক্ষেপে বাপের কথার জবাব সেরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈঠকখানায় এল। পশুপতির দিকে চেয়ে কলকণ্ঠে বলল, বীরসজ্জা ছাড়ুন। ভাল হয়ে বসবেন চলুন উপরের ঘরে।

নড়বড়ে ভাঙা সিঁড়ি, দোতলার সঙ্কীর্ণ ঘর, আমের ডাল নুয়ে পড়েছে জানলার কাছে। দু-জনকে বসিয়ে সেই যে দুর্গা চলে গেছে, আর দেখা নেই। দুপুরে গোলমালের মধ্যে খাওয়া-নাওয়া হয় নি। স্বপ্নেও ভাবে নি, এত হাঙ্গামা পোয়াতে হবে এইটুকু এক পাড়া শাসন করতে এসে। কিন্তু এত

দেরি করে কেন দুর্গা? খাবার তৈরি করে নিয়ে আসছে? হয়তো তাই। আগে আগে খবর পাঠিয়েছে অবশ্য, কিন্তু সমস্তটা দিন যে ঝড় গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তাতে মাথার ঠিক থাকে কি কারো? তাদের নিজেদেরই ছিল না, আর এরা তো নিরীহ নির্বিরোধী সেকেলে-পণ্ডিতের পরিবার।

আমগাছে বাদুড় ঝটপট করছে। হু-হু করে হাওয়া বয়ে গেল, পুরানো জীর্ণ চাটুজ্জে-বাড়ি সহস্র পদশব্দে বেজে উঠল যেন। আমডালের অন্ধকারের দিকে চেয়ে পশুপতির রোম খাড়া হয়ে ওঠে, দাঙ্গায় আহত মানুষগুলোর আর্তনাদ নিঃশব্দতার মধ্যে যেন কানে ভেসে আসছে।

এতক্ষণে কিন্তু দুর্গার আসা উচিত। নাড়ি হজম হয়ে যাবার যোগাড়— আর সে ষোড়শোপচারে আয়োজন করছে নিশ্চয় বসে বসে। কুঠির সাহেব বাড়িতে বসে খাবে, এদের পক্ষে এ স্বপ্নাতীত ব্যাপার। হেলিকে এনেই মুশকিল হয়েছে, মনের মত করে না সাজিয়ে তার সামনে থালা আনবে না কিছুতেই। এলে পশুপতি মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কথা বলবে না দুর্গার সঙ্গে। খিদেয় টলে পড়ে যাচ্ছি, দেখে গেলে—তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না কি তোমার?

পায়ের শব্দ। কান পেতে শুনছে পশুপতি। সিঁড়ি বেয়ে শব্দ উঠে আসছে ধীরে ধীরে। দু-চোখের উদগ্র দৃষ্টি স্থাপিত করে সে তাকাল। হাঁ, দুর্গাই। এতক্ষণের ভেবে-রাখা অভিমানের কোন কথাই এল না পশুপতির মুখে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, এলে?

হ্যাঁ—

ঘরে এল দুর্গা। কুলুঙ্গির প্রদীপটা উঁচু করে ধরল সিঁড়ির দিকে। আলো পড়ে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে তার কালো মুখে। সিঁড়িতে অনেক লোক।

এদের দেখিয়ে দেয়, এই যে—সেবারের পালানো আসামী। আর সেই সাহেব, কেশব-দাকে যে খুন করেছে—

এর পরের কথা সঠিক কিছু বলতে পারব না নিশিকান্ত। এ-ও যা বললাম নিতান্তই গল্প, ঠাকুরমার কাছে শুনেছি। গ্রামের যে-কোন মুরুব্বীর মুখে শুনতে পাবে মোটামুটি এই কাহিনী। উত্তরপাড়া আছে আজও। চাটুজ্জে-বাড়ি বললে লোকে একটা উঁচু ঢিবি দেখিয়ে দেয়। দলিলপত্রে পাওয়া যায়, নীল-বিদ্রোহের পরেই ইণ্ডিগো-কোম্পানি নামমাত্র মূল্যে জয়রামপুরের কনসারন বিক্রি করে দেন নামখানার চৌধুরীদের কাছে। চৌধুরীরা চালাতে পারলেন না। কনসারনের সমস্ত কুঠি বন্ধ হয়ে গেল বছর চার-পাঁচের মধ্যে।

কাজকর্মে ও লোকজনের যাতায়াতে নীলখোলা সমস্তটা দিন সরগরম থাকত—আর আজকে দেখলে নিশিকান্ত তার অবস্থা। নাটা বৈঁচি ও কালকাসুন্দের জঙ্গল, দেয়ালের ফাটলে সাপের আস্তানা, জঙ্গলে লাঠি পিটলে বুনো-শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বেরিয়ে পালায়। কোথায় সেই টুইডির দল! ঠাকুরমার মুখে এবং এর-তার মুখে শোনা গল্পের টুকরো সাজিয়ে গুছিয়ে দিব্যি তোমার কাছে গড়গড় করে বলে গেলাম। যেন নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু গল্প গল্পই। কেশব বলে একজন ছিল বটে, কিন্তু দুর্গার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল—না-ও হতে পারে এমনটা। সেকালের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই—এখনকার কালের মানুষগুলোকে আন্দাজি পুরানো ছকে ফেলে গল্প জমাই। তবে এটা ঠিক, নীলকরদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার গ্রাম্য রায়ত রুখে দাঁড়িয়েছিল, সাদা সাহেব বলে আতঙ্ক ঘুচে গিয়েছিল সেই দূর অতীতেই। তাদের এমন জমিয়ে-তোলা ব্যবসা অসম্ভব করে তুলেছিল। শুধু

জয়রামপুরের এই একটা মাত্র নয়—এক এক করে বাংলার সমস্ত কনসার্ন এদেশী ধনীদের কাছে বিক্রি করে তারা বিদায় নিতে লাগল। খরিদ্দার অভাবে তালা পড়ল কোন কোন কুঠিতে। জার্মান ল্যাবরেটারির সস্তা নীল এসে পড়ায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেল—এমনি একটা কথা সাহেবেরা রটনা করে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য। কিন্তু বুঝে দেখ নিশিকান্ত, জার্মানিকে নির্গোলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থ নেবে—তেমনি পাত্র কি ওরা? একালের ছেলেরা নীল-চাষের কথা বইয়ে পড়ে থাকে, চোখে দেখে নি। বিলুপ্ত ম্যামথের কঙ্কালের মতো এগ্রামে-ওগ্রামে ছড়ানো নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষগুলো না থাকলে তাদের বিশ্বাস করানো শক্ত হয়ে দাঁড়াত নীলকুঠি ও নীল-বিদ্রোহের কাহিনী। তেমনি আমার মনে হয়, আর এক শ' বছর পরে আগামী কালের ভাগ্যবান ছেলেরা ভারতবর্ষে ইংরেজ-প্রভুত্বের ইতিহাসে-পড়া কাহিনীও বিশ্বাস করতে চাইবে না; এখনকার এই বিক্ষুব্ধ দিনের কণামাত্র ছায়া পড়বে না তাদের শান্ত কিশোর মনের উপর।

নীলের ব্যবসা বন্ধ হলেও সাহেবদের আনাগোনা বন্ধ হয় নি কখনো জয়রামপুরে। টুইডির আমলে গ্রাম পত্তনি নেওয়া ছিল—কুঠির হাতায় একটা ঘরে কাছারি বসিয়ে নায়েব-গোমস্তা রেখে কিস্তিতে কিস্তিতে খাজনা আদায় হত। পৌষ-কিস্তির সময় বেশি জমজমাট হত কাছারি। ধান কাটার মুখে বাদায় অনেক পাখি এসে পড়ত, শহর থেকে সাহেবরা দল বেঁধে আসত পাখি শিকার করতে। দুধ-মাছ তরিতরকারি প্রচুর মিলত ঐ সময়টায়। কুঠিবাড়িতে অহরহ মেলা জমে থাকত।

শুধু এই সামান্য সম্পত্তির ব্যাপারে এত দূর টানা-পোড়েন পোষায় না। লারমোর নামে একজন নূতন ব্যবসা ফেঁদে বসল। নীলের চাষ গিয়ে পাট-চাষের বেশি চলন হয়েছে—হাটখোলার পাশে ভদ্রার ধারে টিনের ঘর বেঁধে

লারমোরের পাটের গুদাম হল। লারমোরকে লালমোহন সাহেব বলত চাষা-ভুষা সকলে। পাটের মরস্থমে লারমোর নিজে এসে চেপে বসত। প্রচুর পাট কিনে গাঁইট বাঁধা হত, পরে কলকাতায় চালান দিত মনের মতো দর পেলে। ভত্রা মজে আসছিল। এই সময় ছোট-লাইন বসল, লারমোরের ব্যবসার স্থবিধা হল এতে। শুধু-নৌকাযোগে নয়, স্থলপথে খুব অল্প সময়ে পাট চালান যেতে লাগল।

রেলগাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে জয়রামপুরের ভিতর দিয়ে প্রথম যেদিন স্টেশনে এসে দাঁড়াল, গ্রামবাসী সকলের কি উৎসাহ আর উত্তেজনা! নিতান্ত ছেলে-মানুষ আমি তখন। গোড়ায় একখানা মাত্র গাড়ি দিয়েছিল—সেইটে সকাল-বেলা ছুটত গোলাদানা অভিমুখে, বিকেলে আবার আগরহাটি ফিরে যেত। গোলাদানা নোনা জায়গা—মাছের সায়র ছিল, স্থন্দরবন অঞ্চলের অনেক মাছ আমদানি হত ওখানে। ঐ মাছ এবং মধ্যবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে পাট ও মাদুর চালান যাবে, এই ভরসায় এক বিলাতি কোম্পানি লাইন খুলেছিল। আমাদের জয়রামপুরে রেলের ওয়ার্কশপ হল। এই উপলক্ষে অনেক ফিরিঙ্গি কর্মচারী সপরিবারে এসে উঠল পুরানো সাহেবপাড়ায়। অনেক নূতন বাংলো উঠল, পাড়ার শ্রী ফিরল। হাটও খুব জাঁকিয়ে উঠল লাইন খোলার পরে থেকে। গাড়ি অনেকক্ষণ থাকত এখানকার স্টেশনে, মানুষ ও বিস্তর মালপত্রের ওঠা নামা হত।

কার্জন বাংলাদেশকে দু-টুকরো করেছে, তাই নিয়ে আমাদের গ্রামেও সোরগোল। তখন ফার্স্টক্লাসে পড়ি। বছর ঘুরে আবার তিরিশে আশ্বিন এল—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের তারিখ। পাঁজিতে পর্বদিনের নির্ঘণ্টের ভিতর ছেপে দিয়েছে—জাতীয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন। ভারাক্রান্ত মনে ইস্কুলে গিয়েছি।

পাঠশালায় পর্যন্ত ছুটি—আমাদের ইস্কুল খোলা আছে, ইস্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট লারমোর সাহেব ঐদিন ইস্কুল পরিদর্শনে আসছেন বলে।

নীলকমল দাস আমাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন। ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার সামনে টাক। ফরিদপুরের দিকে কোথায় বাড়ি, চাকরির ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে জয়রামপুরে এসে পড়েন। চমৎকার পড়াতেন, অল্পদিনেই ছেলে-মহলে খুব নাম হল। তখনকার দিনে একখানা ইতিহাস পড়তে হত—'ভারতে ইংরেজের কার্যাবলী' এই গোছের নাম। ইতিহাস আদপেই নয়—ইংরেজ আমাদের আধা-অসভ্য ভারতবর্ষে রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ পোস্ট-অফিস ইত্যাদি সহযোগে স্বরলোক রচনা করেছে, আদ্যোপান্ত তারই ফিরিস্তি। নীলকমল মাস্টারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর গম-গম করে ক্লাসের মধ্যে বাজত, এক সেকেণ্ডও ফাঁকি দিতেন না তিনি। সমস্ত ঘণ্টা পড়িয়ে অবশেষে মন্তব্য করতেন, যা পড়ালাম—আগাগোড়া মিথ্যে কথা। পেটের দায়ে ইংরেজ এসেছিল এদেশে, ছল-চাতুরী করে এখন অধীশ্বর হয়ে বসেছে। যা-কিছু করেছে, সমস্ত নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার সুবিধা হবে বলেই। পেটের দায়ে আমাদের এই আজগুবি ইতিহাস পড়িয়ে যেতে হচ্ছে। তোমরাও মুখস্থ করছ ভবিষ্যতে পেট চালানোর সুবিধা হবে বলে।

বলে তিনি হেসে উঠতেন।

সেদিন তাঁর ক্লাস। কিন্তু মুখে হাস্যলেশ নেই। ইতিহাসের বই না খুলে বাংলাদেশের একখানা ম্যাপ এনে দেওয়ালে টাঙালেন। আমাদের একজনের কাছ থেকে একটা রুল নিয়ে ম্যাপের উপরে সেটা দিয়ে দুই বাংলার সীমানা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আজকের দিনে বিশেষভাবে উপলব্ধি কর—কি দশা করেছে আমাদের। সোনার বাংলা কেটে দু-ভাগ করেছে বাঙালীর প্রাণশক্তি বিচূর্ণিত করবার জন্য।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, উদ্গত অশ্রু সামলে নিচ্ছেন যেন। তাঁর বুকখানাই চিরে দু-ভাগ করেছে, ভাব দেখে এমনি মনে হল। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল আমাদের।

বারাণ্ডার দিক থেকে হেডমাস্টারের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। চিৎকার করে হুকুম দিলেন, ফটক বন্ধ করে দাও। এই দিকেই আসছেন তিনি, জুতার মসমস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলকমল মাস্টার তাড়াতাড়ি দেয়ালের ম্যাপ গুটিয়ে একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলেন। গোড়া থেকে শেষ অবধি উলটিয়ে যান, আবার গোড়ায় আসেন। একটি কথাও বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। রাস্তায় মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্-ধ্বনি। সবাই আমরা কৌতূহলী, কিন্তু হেডমাস্টারের আতঙ্কে গলা বাড়িয়ে বাইরে তাকাবারও সাহস নেই। লক্ষ্মণ বাইরে গিয়েছিল—তোমাদের আজকের সভার সভাপতি লক্ষ্মণ মাইতি, আমাদেরই সহপাঠী সে। ছুটতে ছুটতে সে এসে ঘরে ঢুকল।

নীলকমল মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ওদিকে?

লক্ষ্মণ বলল, বড্ড মারধোর করছে। প্রফুল্ল-দার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তার পগারে অজ্ঞান হয়ে তিনি পড়ে গেছেন।

কোন প্রফুল্ল বুঝতে পারলে নিশিকান্ত? বুড়ি-মেমের কুঠিতে যে হাসপাতাল করে দিয়েছে, আজকের উৎসব-সভার প্রধান উদ্যোক্তা। চাল-সাপ্লাইয়ের কাজে ইদানিং তার প্রচুর টাকা। নূতন যে বাড়িটা করেছে, এ অঞ্চলে তেমন বাড়ি আর নেই। সেই যে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তার শতগুণ পুরস্কার মিলেছে জীবনে! ফাটা-মাথার দৌলতে সে এখন এসেম্বলির মেম্বর। অচিরেই স্বাধীন দেশের মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন হবে, এই রকম শোনা যাচ্ছে। আমাদের দু-ক্লাস উপরে পড়ত প্রফুল্ল, সেই তিরিশে আশ্বিন তারিখে সে ইস্কুলে আসে নি। ভোরবেলা দল বেঁধে ভদ্রায় স্নান করে তারপর এ-ওর হাতে হলদে

রাখি পরিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর বিলাতি কাপড় সংগ্রহ করে স্তূপাকার করছিল—বিকালবেলা হাটখোলায় নিয়ে আগুন দেওয়া হবে সকলের সামনে। বাবার চোখ এড়িয়ে আমিও একবার ওদের সঙ্গে খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি। প্রফুল্লর সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করছিলাম। বাবার কড়া শাসন না থাকলে আমিও কি চুপচাপ ক্লাসে এসে বসতাম আজকের দিনে? এই যে শোনা গেল, মার খেয়ে সে ধরাশায়ী হয়ে আছে—এর জন্যও হিংসা হচ্ছে প্রফুল্লর উপর।

নীলকমল মাস্টার বইয়ের পাতা উলটানো বন্ধ রেখে মুহূর্ত কাল টেবিলের দিকে চেয়ে রইলেন। কি ভাবছিলেন, কে জানে। তারপর আমাদের দিকে দৃষ্টি বিসারিত করে বলে উঠলেন, বন্দেমাতরম্ বলা বেআইনী হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে চেঁচামেচি করে খবরদার কেউ ডেপোমি করতে যাস নে।

চেয়ার থেকে উঠে সামনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, এত গণ্ডগোলে পড়াশুনো হয়? অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। চুপ কর তোমরা এইবার।

আমি বললাম, চুপচাপ বসে থাকি। আজকে আর পড়াবেন না।

ভ্রূকুটি করে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন?

বাইরে তুমুল কাণ্ড। দুয়োর এঁটে শান্তমনে পড়াশুনোর সময় কি এখন?

নীলকমল মাস্টার বললেন, বড় লড়াইয়ের ভিতর কারখানা এক মিনিটও বন্ধ রাখা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় মাপ মিলিয়ে কারিগর বারুদ-গোলাগুলি তৈরি করে।

একটি ছেলে বলল, আমরা বুঝি গোলাগুলি মাস্টার মশাই? ইস্কুল কারখানা?

গোলা-বারুদের চেয়ে ঢের বেশি জোরালো অস্ত্র তোমরা। দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, সেদিনও ইস্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা যাবে না একটা দিনের জন্য।

আর একটা কথাও না বলে তিনি ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের অধ্যায় পড়ালেন। যা পড়াচ্ছেন, ছাপা-বইয়ের সঙ্গে তা মেলে না। সেই একটা দিন পড়লাম বটে নীলকমল মাস্টারের কাছে, আজকে বুড়ো বয়সেও তার স্মৃতি ভুলতে পারি নি। স্বাধীনতার জন্য এই যে আমরা সংগ্রাম করে চলেছি, সেদিন তারই যেন এক পশ্চাৎপট আমাদের কিশোর মনের উপরে তিনি এঁকে দিলেন, ভারতের প্রথম ইংরেজ-বিতাড়ন ব্যর্থ ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা করে। তাঁর মাস্টারি-জীবনের সেদিন শেষ পড়ানো—কোন দৈবশক্তির বলে যেন টের পেয়েছিলেন, তাই তিনি অমন প্রাণ ঢেলে পড়ালেন।

ঘণ্টা শেষ হয় নি, হেডমাস্টারের লিখিত হুকুম এল—সকলকে মাঠে যেতে হবে তখনই। প্রেসিডেণ্টের সামনে ইস্কুলের সমস্ত ছেলে একসঙ্গে ড্রিল করবে, ক'দিন থেকে তার তোড়জোড় চলছিল। ড্রিলের পর সাহেব ছেলেদের সম্বোধন করে দুচারটে উপদেশ দেবেন। কিন্তু সে তো এখন নয়, প্রেসিডেণ্ট ঘুরে ঘুরে সমস্ত ক্লাস পরিদর্শন করবেন—তারপর। আমরা এ-ওর মুখ তাকা-তাকি করি।

গিয়ে দেখলাম, কানু গাঙ্গুলী, আমাদের অনেক নিচে পড়ে—তাকে নিয়ে ব্যাপার। লারমোর সাহেব আর হেডমাস্টার মাঠের প্রান্তে পাশাপাশি দু-খানা চেয়ারে বসেছেন। ইস্কুলের দারোয়ান তাঁদের ঠিক সামনে দৃঢ়মুষ্টিতে কানাইর হাত ধরে আছে। হেডমাস্টারের মুখে-চোখে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। সকল ছাত্র হাজির হলে তাদের সামনে খুব জাঁকালো রকমের শাস্তি দেবেন—এইজন্য বহু কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে আছেন।

কানু—আমাদের কানাই। ফুটফুটে অতি সুন্দর চেহারা বলে ইস্কুলশুদ্ধ সবাই ভালবাসত কানুকে। ক-বছর আগেকার কথা—প্রথম যেবার কানু

ভরতি হল। তখন তার আরও কম বয়স। এই নীলকমল মাস্টারই ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, কানু শুকনো মুখে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নীলকমল হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ফাঁকি দিয়ে এখানে বেড়াচ্ছিস যে তুই ?

ভাল লাগে না মাস্টার মশাই।

তার কোমল স্বরে মুহূর্তে নীলকমল মাস্টারের রাগ জল হয়ে গেল। ছোট শিশু, মা-ভাই-বোনের কাছ-ছাড়া হয়ে এসেছে—ইস্কুলের এত ছেলে, মাস্টার ও নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত একলা মনে করছে। গলা নামিয়ে তিনি বললেন, তা বারান্দায় বেড়াস নে ও-রকম; হেডমাস্টার দেখলে রক্ষে রাখবে না। বেড়া গলে বেরিয়ে যা বাঁশতলা দিয়ে। কুমোরেরা ঐদিকে হাঁড়ি-মালসা পোড়াচ্ছে, দেখে আয়।

নীলকমলের মতো রাশভারি মাস্টার আমাদের সকলের সামনে অবলীলাক্রমে এই এক ফোঁটা ছেলেকে ইস্কুল পালাতে পরামর্শ দিলেন। সেই নিরীহ শিশুর ইতিমধ্যে এমন উন্নতি হয়েছে যে তার শাস্তি-গ্রহণের সাক্ষী হবার জন্য শিক্ষক-ছাত্র সকলে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে আছি কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে। আমরা সবিস্ময়ে বলা-কওয়া করি—হাবা ছেলেটা কি কাণ্ড করে বসেছে না জানি, যার জন্যে কচি মাথার উপর বজ্র-নিক্ষেপের এই আয়োজন!

অবশেষে অপরাধ জানা গেল। কানুর ক্লাশের একটি ছেলে চুপিচুপি বলল। লারমোর হেডমাস্টারের সঙ্গে ক্লাস পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন। কানুদের ক্লাসে গিয়ে সদুপদেশ দান করছিলেন, ছেলেরা এই যে 'বন্দে মাতরম্' বলে হল্লা করে বেড়াচ্ছে, ধামা ধামা বিলাতি নুন এনে পুকুরের জলে ঢালছে, বিলাতি কাপড়ে আগুন দিচ্ছে—এ সমস্ত অত্যন্ত অনুচিত, ছাত্রদের শুধু একমনে পড়াশুনা করাই কর্তব্য। সুরেন বাঁড়ুজ্যের নামে খুব গালিগালাজ করলেন এই প্রসঙ্গে।

কানু উঠে সাহেবের কাছে এল। তার নধর সুন্দর চেহারা দেখে প্রসন্ন হাসি ফুটল সাহেবের মুখে, কি চাই—বলে সস্নেহে তাকে প্রশ্ন করলেন। কানু মুখে কিছু না বলে একগাছি হলদে রাখি পরাতে গেল সাহেবের হাতে। পরাতে প্যারে নি, সাহেব ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলেন।

সকলে সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছি। একবার কানুর দিকে আর একবার হেডমাস্টার ও লারমোর সাহেবের দিকে তাকাই। হেডমাস্টার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সকলের সামনে সাহেবের পা ধরে মাপ চা, নয় তো রক্ষে নেই। নিজের কান নিজে মল্। বল্ আর কক্ষনো এমন করব না।

কানু জবাব দেয় না, ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডমাস্টার এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন তার গালে। কানু পড়তে পড়তে সামলে নিল। তেমনি স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি অফিস-ঘর থেকে বেত নিয়ে এসে সপাসপ কানুর পিঠে মারতে লাগলেন।

নীলকমল মাস্টার ছুটে গিয়ে কানুকে জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকুল পক্ষীমাতা যেমন পালক দিয়ে ঢাকে শাবককে।

হেডমাস্টার বললেন, সরে যান নীলকমলবাবু। এত বড় শয়তানের উপর দয়া দেখাতে চান ?

নীলকমল বললেন, সাহেব ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট—আমাদের আপনার লোক। তাই একটা রাখি পরাতে গিয়েছিল। এই সামান্য ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়েছেন কেন আপনারা ?

হেডমাস্টার বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, সরে যেতে বলছি, আপনি তা শুনবেন না ? বুঝতে পারি না, আপনি কি করে উৎসাহ দেন এ ব্যাপারে।

নীলকমল দাশ সৎকাজে ছেলেদের চিরদিনই উৎসাহ দিয়ে এসেছে !

লালমোরের রোষদৃষ্টি কিম্বা হেডমাস্টারের আস্ফালনে কিছুমাত্র দিক্‌পাত না করে কানুর হাত ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডমাস্টার চেঁচিয়ে বললেন, আর ঢুকবেন না কোনদিন ও-ফটক দিয়ে। প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে আপনাকে বরখাস্ত করা হল।

নীলকমল বললেন, ইস্কুলটাকে আপনারা জল্লাদখানা করে তুলেছেন। কচি ছেলেপুলের উপর জল্লাদ-বৃত্তি করা পোষাবে না আমারও।

নীলকমল আর ইস্কুলে ঢোকেন নি। ক'টি ছেলে পড়াতেন আর খাতা লিখতেন হাটখোলায় এক মহাজনের গদিতে। একলা মানুষ—নিজে রান্না করে খেতেন—এতেই চলে যেত। কিন্তু কানু ফিরেছিল। তার বাবা মহা-মহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ এ অঞ্চলের সর্বশ্রদ্ধেয়। সাহেবপাড়াতেও তাঁর খাতির ছিল। একবার এই লারমোরের জন্যই বহু আয়োজনে তিনি তিন দিন-ব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিলেন। কানুর বৃত্তান্ত কানে গেলে সেই বিকালেই ন্যায়তীর্থ মশায় ছেলেকে হিড় হিড় করে টেনে এনে হেডমাস্টারের সামনে হাজির করলেন। লারমোর তখনো চলে যান নি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। তাঁর বড় ছেলে এই ইস্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পাশ করেছে, এখনো সে সাহেবসুবো ও পূজ্যজনের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করে না। আর এই একফোঁটা ছেলের এই রকম দুষ্প্রবৃত্তি—নিশ্চয় কুসঙ্গে পড়ে এমনটা হয়েছে। ন্যায়তীর্থ মশায় হায় হায় করতে লাগলেন।

কানুর অপরাধের মার্জনা হল। যথারীতি সে ইস্কুলে পড়াশুনা করতে লাগল। কিন্তু কুসঙ্গ ছাড়াতে পারলেন না হেডমাস্টার বা ন্যায়তীর্থ মশায় অহরহ সতর্ক দৃষ্টি রেখেও।

ক্লাসের দেওয়ালে হঠাৎ একদিন একখানা কাগজ আঁটা দেখলাম—

লারমোর ও তাঁহার তাঁবেদার ঐ হেডমাস্টার ত্রৈলোক্য গড়গড়িকে আমরা

চক্ষের পলকে শেষ করিতে পারি। কিন্তু মশা মারিবার জন্য তোপের অপব্যয় করিব না। অস্ত্রবলে ইংরেজকে দূর করিব, তাহারই বিরাট আয়োজন হইতেছে। আমরা তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছি। যে কেহ আত্মদান করিতে চাও, অতি সহজে সন্ধান পাইবে।

সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি, কানু ও আরও অনেকে। অস্ত্রের বিরাট আয়োজনই বটে। ইস্পাতের নয়···সর্বত্যাগী শত শত বীর কিশোরের দেশ-প্রেম ও বীর্যের অস্ত্র।

হাল ফ্যাসানের বাড়িটা দেখছ অবাক হয়ে। পল্লীগ্রামে এমন বাড়ি দুর্লভ। প্রফুল্ল তৈরি করেছে—এরই কথা বলছিলাম নিশিকান্ত। বিয়াল্লিশ সালে আমরা জেলে ছিলাম, তখন মিলিটারি সাপ্লাইয়ে এবং পরের বছর দুর্ভিক্ষের সময় চাল ধরে রেখে সে দেদার টাকা কামিয়েছে। বেনামী ব্যবসা—কাগজে-পত্রে কোথাও ধরা ছোঁওয়া পাবে না। সব্যসাচী নাম দেওয়া চলে প্রফুল্লর—অর্থার্জন আর দেশসেবা একসঙ্গে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে শেষবার জেলে গিয়েছি। শেষবার বলা ঠিক হল না হয়তো। স্বাধীন-ভারত হলে কি হয়, আমাদের কথা বলবার জো নেই। গাজনের সন্ন্যাসীর অবস্থা হয়েছে, ঢাকের বাজনা শুনলেই পিঠ সুড়সুড় করে ওঠে। ইংরেজের সঙ্গে অসম-সংগ্রামে দীর্ঘকাল লাঞ্ছনা-নির্যাতন সয়ে সয়ে বড় স্পর্শকাতর হয়ে আছি আমরা। কানুর কথা, প্রভাস মহারাজের কথা আরও কতজনের কত কথা মনে আসে! তাদের নিষ্ঠার মধ্যে একতিল ফাঁকি ছিল না—তেমনি তাদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে একবিন্দু মালিন্য সহ্য হবে না আমাদের। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে কতদিন চলতে পারব প্রফুল্লদের সঙ্গে?

কিন্তু থাক এ সব। এক বছরের জেল হয়েছিল, সে তো আমাদের কাছে একদিনের সর্দি-জ্বরের সামিল। জেল থেকে বেরিয়ে কিছুকাল এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে গ্রামে এসেছি। প্রফুল্ল এল দেখা করতে। কেন জানি না, আমায় সে অত্যন্ত খাতির করে। অথচ নির্বিরোধী মানুষ আমি, চালের কারবারের তথ্য উদ্‌ঘাটনে লেগে যাব—এমন আতঙ্ক নিশ্চয়ই তার নেই আমার সম্পর্কে। ইংরেজ ছাড়া কেউ কোন দিন আমার শত্রু নয়। ইংরেজও আর শত্রু থাকবে না যদি সরল মনে সত্যি সত্যি নিঃসম্পর্ক হয়ে যায় এদেশের সঙ্গে—নাক ঢুকিয়ে ফের শয়তানি করতে না আসে।

প্রফুল্ল বলল, ভাল হয়েছে—তুমি এসে গেছ। শুনেছ বোধ হয়, ন্যাপলার মা'র বাড়ির জায়গাটা কিনে আমি বাড়ি তোলবার ব্যবস্থা করছি। হাসি কি করে টের পেয়ে গেছে কানুর সমস্ত বৃত্তান্ত।

আজকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রফুল্ল আমাদের সেকালের গোপন কাহিনী জাহির করে বেড়াবে। তাতে তার পশার বাড়বে, আখেরের সুবিধা হবে। কিন্তু সেদিন স্বাধীনতা আসে নি। তাই চারিদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে চুপি-চুপি প্রফুল্ল বলল, একসময় গিয়ে জায়গাটা নিরিখ করে দিয়ে এস। আমি পেরে উঠলাম না। জায়গা সাব্যস্ত হলে আলাদা করে ঘিরে সেখানে কানুর স্মৃতিস্তম্ভ গেঁথে দেব।

দু-একদিন অন্তর এসে ঐ কথা তোলে। তাগিদ দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলল। শেষকালে একদিন কোদাল আর কয়েকটি ছেলে নিয়ে চলে এলাম এখানে। সেকালের মতো এখনকারও কিশোর একদল আমায় ভালবাসে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যা বলি তখনই তামিল করে।

খোঁড়্ দিকি এই জায়গায়। হাত তিনেক খুঁড়লেই বোঝা যাবে। খোঁড়্।

আচ্ছা, আর খানিক দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়্—যতক্ষণ না পাস্, এমনি খুঁড়্তে খুঁড়্তে চলে যা! নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

খুঁড়ছে তারা। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

একজনে প্রশ্ন করল, গুপ্তধন আছে নাকি দাদা এখানে?

সে কি আজকের ব্যাপার নিশিকান্ত? জোয়ান-যুবা ছিলাম, এখন বুড়ো হয়েছি—ছেলেদের কথায় হাসি পায়। সত্যি, গুপ্তধনই বটে। এমন মণি-মাণিক্য ক'টা জাত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে?

হাসিমুখে আমি জায়গার নির্দেশ দিচ্ছি—উঁহু, এদিকটায় আর নয়। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে আমবাগান। এখানে হবে কি করে?...কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদের ওধারেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে কি অবস্থা হয়েছে দেখুন দাদা—

যার দিকে চেয়ে বলছিলাম, সে হাত মেলে দেখাল। টুকটুকে ফরসা বড়লোকের ছেলে—কোদালের মুঠো জীবনে ধরে নি। হাত রাঙা হয়ে গেছে।

এত কষ্ট দিচ্ছি ওদের, তার জন্য অপ্রতিভ হই। বললাম, কি করব—ধরতে পারছি না যে! তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল, বাগিচা, ক্ষ্যাপলার মা'র দো-চালা কুঁড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রি—তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা রাখা হয় নি, আর সময়ও ছিল না তাই। আবার কোন দিন যে খুঁড়ে দেখবার দিন আসবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন?

উৎসাহ দিয়ে বলি, খোঁড়—খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে পেয়ে যাবে একটা কলসি। সোনার নয়, পিতলের নয়, মাটির কলসি।

কলসির ভিতর ?

সেই ফরসা বাবু-ছেলেটি বলল, সোনার মোহর—

আর একটি ছেলে বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে ? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা—

বড়লোকেরা দিত ! টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি করে ?

আমি বললাম, দিত কি সাধ করে রে ভাই !

সেই পুরানো কালের কথা ভেবে কষ্ট হয়। কত শক্তি, উদ্যোগ ও জীবন নষ্ট হয়েছে টাকা-সংগ্রহ ব্যাপারে ! তরুণেরা প্রাণ দিতে অকুণ্ঠে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু টাকার সিন্দুক আগলে ছিল বড়লোকেরা। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, মহা-শক্তিধর ইংরেজকে বিদায় দিতে হবে অদূরকালে, সর্বরিক্ত স্বপ্নবিলাসী আমাদেরই দল জয়যুক্ত হবে।

একটি ছেলে আমার কথার পরিপূরণ দিল, দিত না বলেই তো এঁরা ডাকাতি করে আনতেন।

আমি হেসে বলি ডাকাতি কখনো স্বীকার করি নি। বলে আসা হত, দেশের কাজে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, স্বাধীন-ভারতে সুদ সমেত পরিশোধ করা হবে। সেই সব উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারীরা জাতীয়-ঋণ বলে স্বচ্ছন্দে টাকার দাবি করতে পারে আজকের গবর্ণমেণ্টের কাছে। দেশের কাজেই লেগেছিল সে টাকা পুরোপুরি। এক একটা রিভলভারেরই জন্য লাগত পাঁচ-শ' থেকে হাজার। কি রকম খরচ তা হলে বোঝ।

গাছতলায় ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। নজরের সে জোর নেই। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছি, এইরকম মনে হচ্ছে। গাছপালা-বিহীন এই সুপ্রশস্ত জায়গা, আশে পাশে উদ্ধত আধুনিক বাড়ি কয়েকটা—সেকালের সঙ্গে কিছুতে এদের যোগ ঘটাতে পারে নি। দু-তিন বছর পরে

এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে নূতন পরিচয় শুরু করি—ভাল চেনা-জানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে আটকে রাখে।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। ডাক্তার যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছে। দু-হাতে রোজগার করছে সে-ও, তাকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। মান ইজ্জত খুব। প্রফুল্লর হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তো আছেই—তা ছাড়া গবর্ণমেন্টের পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছে এই জয়রামপুরে থাকা সত্ত্বেও। আর বেশি দিন এখানে থাকবে না জানি, কলকাতায় গিয়ে উঠল বলে ভাল সরকারি চাকরি নিয়ে।

তিন বার গিয়ে রাত্রি সাড়ে-নটায় ডাক্তারের দেখা পেলাম। মোটর-সাইকেল কিনেছে, সাইকেল চাকরের জিম্মায় দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল, আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এল।

চোখে আজকাল কম দেখছি অমূল্য ভাই, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে।

কোন্ জায়গা ?

মনে পড়ছে না ? ন্যাপলার মা'র বাড়িতে সেই যে রাত্রিবেলা—

অনেক দিনের কথা, মনে না পড়ার জন্য অমূল্যকে দোষ দেওয়া যায় না। অবশেষে তার মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, আমাকে আর ও-সবের মধ্যে কেন দাদা ? ও, বি, ই, টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

বললাম, ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। বেড়াচ্ছ না বেড়াচ্ছ—কে দেখছে অত সকালে ? ছেলেরা আজ সমস্তটা দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

কবে কে আমার হাত এড়াতে পেরেছে বল নিশিকান্ত? এখনই দেখছ তো—তোমাদের এমন জরুরি মীটিং, তবু কাজকর্ম ফেলে গল্প শুনে বেড়াচ্ছ তুমি এই বুড়োর সঙ্গে। অমূল্য ডাক্তারকে এইখানে এনে তবে ছাড়লাম। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেও হয়—সেই সময়ে দু-জনে এসেছি। আম বাগান কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনে ঢেলেছে গাড়ি গাড়ি, খোয়া ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে। অমূল্যর চোখ চকচক করে উঠল।

উঃ—বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো, এতটা জমি নিয়ে! এদিকে আজকাল বড় একটা আসা হয় না—এত এড় ব্যাপার—তা জানতাম না।

ঘুরে ঘুরে সন্ধান করছে, কিন্তু মন তার ওদিকে। আবার বলতে লাগল, অ্যাসেম্বলির মেম্বর—মোটা মাইনে ভাতা, তার উপর সাপ্লাইতে কম টাকা পিটেছে! ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে নামলে মুনাফা অনেক বেশী ছিল দেখছি। আর আমার সুযোগ ছিল—আধাআধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

অবশেষে সন্ধান হল জায়গাটার। অমূল্যই দেখাল।

কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ বলে দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের গোড়া নিশানা করে খুঁড়তে বলবেন ওদের।...খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, খড়ি দিয়ে দেগে দিয়ে গেছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ!

অমূল্য দেরি করল না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হল।

ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, শুনে আরও ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের ডেকে নিয়ে

এলাম। প্রফুল্লর এত হাঁটাহাটি তো এই ভয়েই—কবরের উপর পাছে বাড়ি গেঁথে বসে।

খোঁড়—

মিস্ত্রি-মজুরেরা হাঁ-হাঁ করে এল। এখানে কি মশাই? আর যেখানে যা ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর কোদাল চালাতে দেব না!

বললাম, তোমাদের বাবুকে খবর দাও গিয়ে। তার কাছ থেকে শুনে এস, সে-ই বা কি বলে।

ছুটে চলল তারা। কাজ বন্ধ করি নি, ছেলেরা খুঁড়ে চলেছে। কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। পরে সরকারবাবুর মুখে শুনেছিলাম, ওদের যা কথাবার্তা হয়েছিল প্রফুল্লর সঙ্গে। প্রফুল্ল অবহেলার ভাবে জবাব দিল, যাকগে, বুড়োমানুষ যা করছেন করতে দাও—

সরকার আশ্চর্য হয়ে বলল, এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল—আজকে যেখানটায় আরম্ভ করেছেন, তাতে আমাদের প্লানমতো কাজ করা কোন মতেই আর চলবে না।

প্রফুল্ল বলল, প্লান বদলাতে হবে তা হলে। চুপচাপ দু-চারদিন তোমরা বসে থাক গে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার, উনি করে চলে যান।

দু-চার দিনের আর দরকার হয় নি নিশিকান্ত, কলসি সেইদিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ হল কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে ক'টি ছেলের সঙ্গে আমি গল্পগুজব করছিলাম। ক্ষীণ শব্দ শুনে ছুটে এলাম সেই জায়গায়।

বেরিয়েছে? ইস, কানায় কোপ ঝেড়ে দফাটি সেরে দিয়েছিস একেবারে!

কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছিল কোদালের কোপ্ লেগে! ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে কি আছে ওর ভিতর—যার জন্য এত

উঠে পড়ে লেগেছি ঐ কলসি আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই—সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে তা ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি বের করে দেখবে তার আগেই আমি এসে পড়েছি।

হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একটা খোটা পুতে রাখ ঐখানটায়। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কি না—

কলসি উপরে নিয়ে এল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছি! ছেলেরা চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। তারা মনে করছে, কি তাজ্জব জিনিস না জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মানিক। মাটি বের করে যাচ্ছি আমি, কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে?…তারপর পেয়ে গেলাম। আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে ছেলেদের বলি, হ্যাঁ—এই বটে!

মুঠো খুলে তাদের দেখালাম—কড়ি কতকগুলো। বললাম, পাওয়া গেছে রে—ঐ সেই জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে রেখে আয় ওখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার চোখে সহসা জল আসবার মতো হল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম, খোঁটার আগায় নিশান উড়িয়ে দে। কানু গাঙ্গুলীর কবর এখানটায়।

গাঙ্গুলীর কবর—বলেন কি?

মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ ন্যায়তীর্থ মশায়ের ছেলে।

বুড়ো হয়ে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে নিশিকান্ত, অতি-নিকটের

জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পাই নে। মনের দৃষ্টি কিন্তু পরিচ্ছন্ন আছে। বরঞ্চ বুড়ো হয়ে যেন স্বচ্ছতর হচ্ছে দিন দিন, দূর-কালের ঘটনা জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। যেন এখন—এই মুহূর্তে ঘটছে সমস্ত চোখের উপর। আজকে জয়রামপুরের সমৃদ্ধি বেড়েছে; মিউনিসিপ্যালিটি বসেছে, অনেকগুলো পাকা-রাস্তা। তখন একটামাত্র পাকা-রাস্তা ছিল সাহেবপাড়া থেকে আগরহাটির গঞ্জ অবধি। তারপর মিটার-গেজের লাইন বসল পাকা-রাস্তার পাশ দিয়ে, রাস্তারই একটা অংশ দখল করে। ভদ্রার কূলে সাহেবপাড়ার প্রান্তে রেলের ওয়ার্কশপ। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে; সাহেব-কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল। এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোট-রেলের কোনই চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে, যুদ্ধের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন দস্তুরমতো যুবাপুরুষ আমি—বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপি টিপি চলেছি। আজকের স্বনামধন্য প্রফুল্ল মজুমদার এম এল এ মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লর বাড়ি থেকেই সব রওনা হয়েছি। প্রফুল্লর বোন হাসি। মোটা থপথপে—বিধবা মেয়েটা তখন ছিল নিতান্ত ছেলেমানুষ। কি রকম সন্দেহ হয়েছিল বুঝি তার—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ খাইয়ে দিল কানুকে। কানু কিছুতে খাবে না, তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে সেই প্রথম সে তার হাত ধরল—গা সিরসির করে উঠেছিল কি-না বলতে পারিনে সে দিনের কুমারী মেয়ে হাসির।

অন্ধকার বর্ষারাতে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছি। নীলরতন মাস্টার ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছেন, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে তাঁর কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে। হ্যাঁ—দেয়ালে আঁটা সেই কাগজের লেখকের সন্ধান করতে

করতে নীলরতন মাস্টার মশায়ের নূতন পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। ফেরারী হয়ে ছদ্মনামে জয়রামপুরে এসেছিলেন। বছর চারেক পরে আবার একদিন সহসা অদৃশ্য হয়ে যান।

ওয়ার্কশপের কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে আর খানিকটা গিয়ে সাহেবপাড়ায় পা দিলে মনে হয়, নন্দনকাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো পরিচ্ছন্ন নলের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালী চুল বাতাসে ওড়ে। রাত্রে জোরালো পেট্রোমাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তায় অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেব-পাড়ায় কি দেখে এল সেই গল্পগুজব করে, দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে—তাদের কাছে সগর্বে ঐ সব কাহিনী বলে।

খবর এসেছিল, লারমোর সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সদর থেকে এসেছেন। মরশুম এসে পড়েছে—পাট কিনবার জন্য এখন হপ্তায় হপ্তায় টাকা আসবে কলকাতার হেড-অফিস থেকে। গাড়ি আজ লেট ছিল, সন্ধ্যার পরে এসে পৌঁছেছেন, সমস্ত টাকা সাহেব নিজের কোয়ার্টারে আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, অফিসের আয়রন-সেফে রাখেন নি—এ অঞ্চল অনেক দিনের চেনা-জানা—টাকা-কড়ি সম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক হবার প্রয়োজনও মনে করেন নি।

একটা কথা জেনে রাখ নিশিকান্ত, সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি, সারা দুনিয়ায় নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে, লবন সত্যাগ্রহে কিম্বা আগস্ট-আন্দোলনের সময় বহু ক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর সবাই দেখেছ—আর আজকে আমার কাছ থেকে শোন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দাদের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয়-সিলিণ্ডার রিভলভার হাতে রয়েছে, কিন্তু লারমোর সাহেব ট্রিগার টিপলেন না, কাঁপতে

কাঁপতে তাঁর হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তাঁর মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়। দলের একজন দু-জন করে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, সম্রাটের জ্ঞাতিগোষ্ঠি অতগুলো প্রাণীর তাতেই প্রায় মূর্ছার অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

বেরিয়ে চলে আসছি—সাহেবরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে, তারা কিছু করেনি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধল। বাহাদুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সে-ই। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, আর অব্যর্থ ঠিক—কানাই মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে এই গোলযোগে কুলিবস্তি থেকে পিল-পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবদের হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। পাশে বসে একটুখানি দেখব, রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করব—সে উপায় নেই। পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে, বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

আজ বলে নয়—চিরদিনই সাফ বুদ্ধি প্রফুল্লর, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্য তিন-চার জনে মিলে উল্টোমুখো পাকা রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেব ক'জন পিছু ছুটেছে। বকুলতলার অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সুযোগের অপেক্ষায়। সবাই খুব খানিক এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি জাঙালের ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা ভাল করে একবার দেখবার চেষ্টা করলাম—যে মুখে ওরা লাথি মেরে গেছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা

গড়িয়ে পড়ছে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে। সাহেবরা প্রফুল্লর পিছু-পিছু যখন ছুটছিল, বকুলতলা থেকে ওদের টর্চের আলোয় দেখলাম—ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে কানাই—পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে আমি দেখলাম, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

কানুকে নিয়ে এলাম এখন ঐ যে বিশাল কম্পাউণ্ড—ওরই ভিতর। তখন প্রকাণ্ড আমবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত—ন্যাপলার মা বলে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতাম আমরা, মা ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্ঝাট পোহাত! রাতবিরেতে যখনই দায় পড়ত, আমরা চলে আসতাম ন্যাপলার মা'র ওখানে। ন্যাপলার মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই—কতদিন আমাদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষী ছিল সে! দশ বাড়ি ধান ভেনে গোবর-মাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে করতে কোন্ অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি। কিন্তু আশ্চর্য এই, কখনো কোন অবস্থায় আমাদের বিষয়ে একটা কথা বুড়ি উচ্চারণ করে নি।

ন্যাপলার মা'র ঘরের ভিতর তো এসে নামালাম কানুকে। টেমি জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে! কানুর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প। অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার মা সজল চোখে—বাসনপত্র তো নেই—নারিকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। কানুকে নামিয়ে রেখে আমি ছুটে বেরিয়েছি ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও

সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল—ঐ অমূল্য সরকার। তাকে খবর দেওয়ার অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য, ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। প্লুরিশির মতো হয়—মাস ছয়েক তাই গ্রামে থেকে বিশ্রাম করছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না। অতএব অমূল্যের চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায়?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের একখানা চৌরিঘরে সে শুত, আমার জানা ছিল। দরজায় টোকা দিলাম, ঘুম ভাঙল না। তখন ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিসফিস করে ডাকতে লাগলাম, অমূল্য! অমূল্য! সে পাশ ফিরে শুল। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কি?

চুপ! বেরিয়ে এসো—

মেঘ জমে আছে আকাশে, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বললাম, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগগির চল।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশনের যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে। যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোন রকম ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে, খুঁজে পেতে ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সের মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে আমার সঙ্গে চলল।

গিয়ে অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টরটর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প করছে, কেমন করে ধোঁকা দিয়ে দলসুদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁ—করে দৌড় দিল

পাটক্ষেতের দিকে—পুরো দমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে? এ ক্ষেত থেকে সে ক্ষেত—শেষকালে চারিদিকে দেখে শুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্য। হাসিতে উদ্ভাসিত কানুর মুখ, প্রফুল্লর গল্প সে খুব উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি, যন্ত্রণায় মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে, হাসির প্রলেপ কিন্তু তার ঠোঁট দু-খানার উপর।

টেমির আলোর তিন দিকে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হল, কানুর দেহ ছাড়া বাইরে কোন দিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর আমি দু-পাশে তৈরি হয়ে বসেছি, কানু ইসারায় মানা করল—ধরবার প্রয়োজন হবে না তাকে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নূতন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে এমনভাবে চিরতে লাগল যে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল। এ বীভৎস ব্যাপার চোখ মেলে দেখা যায় না—কাজ সেরে টেমি নেভাতে পারলে বেঁচে যাই।

কিন্তু কোন লাভ হল না নিশিকান্ত, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আসে। একবার দেশলাই জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে আমরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছি। ন্যাপলার মা জল গরম করবার জন্য মাচার উপর থেকে টেনে শুকনো নারিকেলপাতা বের করছে। প্রফুল্ল ডেকে বলল—থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানে বসে পড়ল ন্যাপলার মা।

আমগাছের বাসা থেকে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে আমরা চমকে উঠলাম—রাত আছে মোট ঘণ্টা দেড়েক। ন্যায়তীর্থ মশায় গত হয়েছেন—প্রফুল্ল ছুটল কানুর দাদা বলরামের কাছে—একটিবার শেষ দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হ্যাঁ নিশিকান্ত, রায়সাহেব বলরাম গাঙ্গুলী, ডাকনাম ছিল বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে? এমনি সর্বত্র—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোশামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে হয়তো দেখতে পাবে ইংরেজের প্রবলতম শত্রু তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা ফাটানো যায়, কিন্তু মনের মাথায় যে লাঠি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজদের নিরাপদ ভূমি এক টুকরাও ছিল না—কেউ ভাল চোখে দেখত না ওদের। কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমতলায় নাটার ঝোপের আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমন সময় রায়সাহেব এলেন, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন।

বলরামকে বললাম, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলী মশাই, আপনার মাকে নিয়ে এলেন না কেন? তিনিও একটু দেখে যেতেন।

বলরাম বিচলিতভাবে না-না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ইদানীং বেড়াচ্ছিল সেইভাবে,—একদিন এক পলক দেখা গেল-তো মাসখানেক আর পাত্তা নেই। না-না, মাকে আর এর মধ্যে টানাটানি করতে যেও না। এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—বাড়িসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুরঝুর করে আমি আর অমূল্য গুঁড়ো-মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছি দেহের চারিদিকে। প্রফুল্ল চলে গেছে আজকের ব্যাপারে টাকাকড়ি যা পাওয়া গেছে, তার বিলিব্যবস্থা করতে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে সহসা রায়সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে তোমরা ?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে গেলে জানাজানি হয়ে পড়বে, এ ছাড়া উপায় কি ? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে !

বলে নিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

আমি বললাম, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের কাগজের রাজনীতি করে, পাথার নিচে বসে বকরার হিসাব কষে, তাদের কাছে ! লড়াইয়ের মুখে জাত-বেজাতের হিসাব থাকে না রায়সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নধর গায়ে চাপাতে কেমন মায়া লাগছিল, তার মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় মাটি গুঁড়িয়ে গুড়িয়ে ফেলছি। ন্যাপলার মা এই সময়ে মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা, এ সব ওর সঙ্গে দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে !

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—যা এত বছর তার নিঃশেষিত দেহ-চিহ্নের নিশানা হয়ে রয়েছে ভূমি-গর্তে।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশের চেলা সাজিয়ে

ঢেকে দিলাম। এইসব কাঠ-পাতা যেন অনেকদিন ধরেই এই রকম পড়ে আছে—কেউ যাতে তিলমাত্র সন্দেহ করতে না পারে!

সন্দেহ কেউ করে নি। অমূল্য বড় ডাক্তার—সরকার মহলে অনেক নাম। রায়সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায় বাহাদুর-রূপে কিছুকাল আগে রিটায়ার করেছেন। আমাদের প্রফুল্ল এম, এল, এ, হয়ে সরকারি চাল-সাপ্লাইয়ের কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। হ্যাপলার মা বুড়ি কোন্ কালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশপাশের অনেক জমি নিয়ে অপরূপ বাগানবাড়ি হয়েছে প্রফুল্লর।

কানুর স্মৃতিস্তম্ভ আজও হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এবারে স্বাধীন-ভারতে নিশ্চয় প্রফুল্ল গেঁথে দেবে—আর টালবাহানা করবে না। বছরের একটা দিন বিশ-পঞ্চাশ জন জমায়েত হয়ে সভা করেও যাবে হয়তো এখানে কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সেকালের সে প্রফুল্ল আর নেই। কজনই বা মনে রেখেছে কানুকে! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম কেউ দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর। কিম্বা… ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা হাসির ভাবটা কেমন কেমন!

নাছোড়বান্দা তার কাছে একদিন অবশেষে বলে ফেলেছিলাম আগাগোড়া এই কাহিনী। আমা হেন লোক—আমারও মুখ খুলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ মেয়েটার কাছে। হাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে গেলে—কোথায় গেলে তোমরা তারপর দাদা? কানাই গেল কোথায়? মিথ্যা বলা আমাদের অনেক সাধনা করে অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিশ-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে কত মিথ্যা বলে গিয়েছি, কিন্তু সজল-চোখ মেয়েটার সামনে মুখ দিয়ে কিছুতেই আমার মিথ্যা বেরুল না। হাসির চেহারা দেখে তোমার হাসি পাবে হয়তো। ঐ স্থূলবপুর নিচে একটি বেদনা-খিন্ন মন

আছে, বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু চুপিচুপি বলি নিশিকান্ত, আমার মুখে কানুর কাহিনী শুনে বিধবা মেয়েটা আকুল হয়ে কেঁদেছিল সারা বেলা ধরে।

দেশব্যাপী কি ঝড় উঠেছিল, ভাবতে গেলে এখন তাজ্জব লাগে। আশার ক্ষীণতম আলো ছিল না সেদিন চোখের সামনে, তবু প্রাণ দেবার মানুষের অভাব হয় নি। বরঞ্চ এর জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না, অনেক সময় বাজি ফেলে ঠিক করতে হত কে কোন্ এ্যাকসনে যাবে। মরে মরে তারা মরার ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেল, তাদেরই মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি উঠেছে। কিন্তু শুধুই বা তাদের কথা বলি কেন? নীলকর-আমলের গরিব রায়তদল কিম্বা বিয়াল্লিশের আগস্টের অনামী আত্মত্যাগীরা কি নয়? শুধু এই এক জয়রামপুরের সংগ্রামীদের কথা আজকে পুরো দিনটা ধরে বললেও বোধ হয় ফুরোয় না। এমনি দেশের সর্বত্র! তার ক'টা ঘটনাই বা জানি আমরা? মোটের উপর—অত্যাচার যত কঠোর হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ততই ছড়িয়ে পড়েছে গণমানুষের মধ্যে। জালিয়ানওয়ালাবাগে দশ মিনিটে ষোল শ' গুলি ছুঁড়ে মহাবীর ডায়ার অন্তত ষোল শ' গুণ বাড়িয়ে দিল আন্দোলনের গতিবেগ।

আরও অনেক বছর কেটেছে তারপর। মুক্তি-রথের সারথি গান্ধিজী। নানাকাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকি। গ্রামে এলে চাষীরা ঘিরে ফেলে, গান্ধিরাজার খবর কি?

একদিন, মনে আছে নিশিকান্ত, খেজুরবনের মধ্যে বসে পড়তে হয়েছিল তাদের আগ্রহাতিশয্যে। সাড়া পড়ে গেছে সমস্ত বিলে, লাঙল ছেড়ে একে একে ছুয়ে এসে জড় হচ্ছে। বোঁদার আগুন কল্কেয় ভেঙে দিয়ে কাদা-মাখা পা ছড়িয়ে আমায় ঘিরে বসেছে।

লড়াইয়ের খবর বল। কে জিতছে? কোম্পানি না গান্ধি রাজা?

অনেক দূরে—ঠিক কোন্ জায়গায় সঠিক আন্দাজ নেই, এই দেশেরই কোন প্রান্তে ঘটছে প্রচণ্ড মহাযুদ্ধ। অমিত পরাক্রম গান্ধিরাজার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৈন্য, বিপুল অস্ত্রসম্ভার। ইংরেজ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

লোকালয় অনেক দূরে, বিলের বাতাস হু হু করে বইছিল। চষা ক্ষেতের মাটির চাংড়ার উপর বসে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করেছিলাম আমি। সে ছবি আজও মনে করতে পারি নিশিকান্ত। তারা বুঝবে না, কিছুতে বিশ্বাস করবে না—ইংরেজের প্রবল প্রতিপক্ষ সেই মহারাজার হাঁটুর নিচে কাপড় জোটে না। সসৈন্যে আক্রমণ করতে চলেছেন গান্ধি রাজা, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা গোণা উনআশি জন। আরও পরমাশ্চর্য ব্যাপার—না রাজা না সৈন্য, কারো হাতে অস্ত্র নেই—গরু তাড়ানোর পাচনবাড়ির মতো একটুকরা লাঠিও নেই। ঘোড়ার পিঠে নয়, রেলগাড়ি বা মোটরগাড়িতে নয়—সবরমতী থেকে ডাণ্ডি এই দু-শ মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন তাঁরা। তাতেই থরহরি কম্পমান ইংরেজ সরকার।

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি, একেবারে অরণ্যে রোদন হচ্ছে, কেউ একবর্ণ বিশ্বাস করছে না আমার কথা। গান্ধি-রাজার মহৈশ্বর্যময় সিংহাসনের উপর অর্দ্ধনগ্ন ফকিরকে আরোপ করতে তাদের অন্তরাত্মা সায় দিচ্ছে না।

অবশেষে একদিন গান্ধি-রাজার সৈন্য আমাদের জয়রামপুর অবধি হানা দিল। তিন জন মাত্র তারা। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা কিছু ভাল রাজার চেয়ে। মাথায় সাদা টুপি, গা ঢাকা আছে জামা দিয়ে।

গান্ধি-মহারাজের জয়!

সকালবেলা তিনকণ্ঠে সমবেত জয়াকার দিয়ে তারা গ্রামে ঢুকল। যত দিন

যাচ্ছে, ততই প্রবল হচ্ছে জয়ধ্বনি। গান্ধি-রাজার সৈন্যে গ্রাম ভরে গেল দেখতে দেখতে, তিনটি মাত্র ছেলের জায়গায় শ'তিনেক হয়েছে—সারা অঞ্চল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা।

নোনাখোলা বলে একটা জায়গা আছে নিশিকান্ত, আর খানিকটা এগিয়ে ডাইনের দিকে। উঁচু টিলা—অনতিদূরে মজা খাল। চারিপাশের দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেতের মধ্যে অনুর্বর শ্বেতাভ টিলার মাটি, একটা দূর্বাঘাসও জন্মে না এমন ভয়ানক নোনা। মাটির কণিকা জিভে দিলেও নোনতা স্বাদ পাওয়া যায়। কোদালি দিয়ে সেই মাটি তুলে নিয়ে জলে গোলা হল। আর ওদিকে আমাদেরই দু-জন আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে ছুটল আগরহাটি থানায় খবর দিতে।

দারোগা বললেন, নুন তৈরি করছেন, তালগাছ কেটে কেটে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পিছনে এমন করে লেগেছেন কেন বলুন তো? কেশবপুরে মদের দোকানের সামনে লাঠি পেটা করে এই সবে এসে দাঁড়িয়েছি মশায়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর একদফা নিমন্ত্রণ। এক গ্লাস জল খেয়ে ঠাণ্ডা হব, কি টের পাই নি বলে দুটো জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখব—তারও আপনারা উপায় রাখেন না। আমাদের মেরে ফেলবেন নাকি দৌড়ঝাঁপ করিয়ে?

সংবাদ বাহকেরা হেসে উঠল।

দারোগা আগুন হয়ে বললেন, চরকির মতো ঘুরখাক খেয়ে মরছি—হাসবেন বই কি আপনারা! কিন্তু থাকবে না ও-হাসি। নিংড়ে মুছে দেব। লাঠি মেরে হবে না, মার খেয়ে খেয়ে চামড়া পুরু হয়ে গেছে—বন্দুক দিয়ে ঘায়েল করব।

দারোগা সেদিন অবশ্য ভয় দেখানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু ক্ষণে-অক্ষণে কথা পড়ে যায় নিশিকান্ত। এর কিছুকাল পরে গ্রামের লোকের চৌকিদারি-

ট্যাক্স বন্ধ করল। ট্যাক্সের দায়ে গরু-বাছুর থালা-ঘট-বাটি টেনে-টুনে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে স্ফূর্তি করে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাচ্ছে সকলে পাড়ায় পাড়ায়। সেই চরম উত্তেজনার সময় পুলিসের গুলিতে সত্যিই মারা পড়ল আমাদের বাসু। বাসুর নাম আছে দেখো আজকের সভায় যারা শহীদ-পদক পাবে তাদের তালিকার মধ্যে। লক্ষ্মণ কম্পমান হাতে পদক তুলে আমাদের নাম পড়বে।

কিন্তু যা বলছিলাম। দুপুর-রোদে তেতেপুড়ে দারোগা দলবল নিয়ে হাজির হলেন নোনাখোলায়। টগবগ করে ফুটছে নোনাজল। লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি ভাঙল, উনুন নিভে গেল জল পড়ে।

কিন্তু গান্ধি-রাজার সৈন্য কেউ পালায় না থানার মানুষ দেখে। সরল সাধাসিধে কথা। আমাদের গাঁয়ের মাটিতে ঈশ্বরের দেওয়া নুন আপনি ফুটে বেরিয়েছে, তুলে খাব আমরা। স্বাভাবিক অতি-সাধারণ এর অধিকার।

জয়রামপুরের গৃহস্থ-চাষী মেয়ে পুরুষ মন্ত্রের জোরে সহসা নূতন আত্মমর্যাদা পেয়েছে। নিচু মাথা সবল সমুন্নত হয়েছে, বজ্রদৃঢ় হয়েছে শিরদাঁড়া। গান্ধি-রাজার সম্পর্কে কত অলৌকিক আজগুবি কাহিনী চলিত ছিল—হঠাৎ সবাই উপলব্ধি করল, কোন সময়ে তারাও গান্ধিরাজার সৈন্য হয়ে গেছে।

বাসুর কথা বলছিলাম। এস, এই ভাঙা চাতালটার উপর বসি। গল্পটা আগে শোন, তারপর একটি প্রশ্ন করব তোমার কাছে। ইদানীং প্রায়ই একটা সন্দেহ জেগে উঠে মনকে পীড়িত করে—জেলের মধ্যে অনেক ভেবেছি, তারপর বেরিয়ে এসে শান্তি-বউদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাসুর কথা নয় —তার পাসও বাপ যতীন-দার কথা। কিন্তু শান্তি জবাব দেয় না। স্তব্ধ হয়ে পায়ের নখে রাস্তার ধুলোয় দাগ কাটে। আমার প্রশ্ন যেন কানেই যাচ্ছে না

—সে ঘুরে ফিরে কেবলই বাসুর কথা তোলে। তার মানে যতীন-দারপ্রসঙ্গে লজ্জা পায়, লোকে যতীন-দার কথা ভুলে গেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে যেন বউদি। এই ঘাটে কাল শান্তি-বউদি আছড়ে আছড়ে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় কাচছিল। দশের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বাসুর পদকখানা নিতে হবে তো, তাই বউদি কাপড় কেচে সাফসাফাই করে নিয়েছে।

বাসুকে যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, নিশিকান্ত। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গলায় কারে বাঁধা রূপোর কবচ—তার ভিতর নারায়ণের তুলসী, যাতে কোনরকম বিপদ-আপদ না ছুঁতে পারে। দু তিনটে মরে যাবার পর এই ছেলে—সর্বক্ষণ বউদির মন পড়ে থাকত তার উপর, তিলেক সে চোখের আড়াল হলে বউদি অস্থির হয়ে উঠত।

বাসুর সঙ্গে পেরে ওঠা সোজা কথা? হাটবারে গ্রামের পাশ দিয়ে সারবন্দি বোঝাই গরুর গাড়ি যেত। কতদিন দেখেছি, বাসু পিছন দিক্ দিয়ে কোন্ ফাঁকে তার একটায় উঠে গুটিসুঁটি হয়ে বসে আছে। লক্ষ্য, নীলখোলার বৈঁচিবন—পায়ে হেঁটে যাবার কষ্টটুকু এড়াতে চাইত এমনি করে। আজকে দেখছ নিশিকান্ত, ভাঙা চোরা একখানা দু-খানা ঘর আর পোড়ো-ভিটে। সে আমলে মনে আছে, এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর উঠান পার হয়ে আমাদের পাড়ার ভিতর ঢুকতে হত। গোলকধাঁধা বিশেষ—ঢুকে পড়ে নূতন লোকের পক্ষে মুশকিল হত বেরিয়ে যাওয়া। ভিটের উপর দেখ, এখানেও কসাড় বৈঁচির জঙ্গল এঁটে এসেছে। বাসু থাকলে সুবিধা হত, কি বল—কষ্ট করে আর তার নীলখোলা অবধি যেতে হত না।

একটা তাজ্জব কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে নিশিকান্ত, এইখানে এসে যখন বসে থাকি। এক লহমার মধ্যে কি হয়ে যায়—চেখের উপর স্পষ্ট দেখি, এই পুকুরের চারপাশে চারটে ঘাট—খেজুরগুঁড়ি দিয়ে বাঁধা, ঠিক যেমনটি দেখে

এসেছি ছেলেবয়স থেকে। পাড়ার মধ্যে একটিমাত্র পুকুর—আমাদের বেটা-ছেলেদের ভারি মুশকিল ছিল, খানিক বেলা না হলে আসবার উপায় ছিল না কোন ঘাটে। দেখ, নূতন বউ ওদিকে পানকৌড়ির মতো ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে, জল ঝাড়বার জন্য এলোচুলে দিচ্ছে গামছার বাড়ি, জলকণা রোদে ঝিল-মিল করছে। দেখ, দক্ষিণ-ঘাটে ঝকঝকে পিতলের কলসি কাঁখে শান্তি-বউদি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, একরাশ এঁটোবাসন নিয়ে ঘাট জুড়ে আছে অন্ন—সেখানে পা ফেলবার উপায় নেই—তুখি কাল মুক্তেশ্বরের মেলা থেকে এসেছে, বাসন ফেলে রেখে হাঁ করে গিলছে তার কথা। শান্তি-বউদিকে দেখে বলল, এই হয়ে গেছে, দিদি দাঁড়াও—এই ক'খানা ধুয়ে নিয়ে উঠছি আমি। থালার উপর মাজনি দিয়ে জোরে জোরে সে ঘষতে লাগল। আর গাবতলার ঘাটে যেন ডাকাত পড়েছে, দাপাদাপি করছে একপাল ছেলে-মেয়ে, সাঁতার কাটার মুরোদ নেই—খোঁটা ধরে পা ছুঁড়ছে। মুক্তোপিসি স্নান করতে এসে এদের কাণ্ড দেখে জলে উঠলেন।

ঘুলিয়ে জল দই দই করে ফেলল হতচ্ছাড়ারা? ওঠ এক্ষুণি—নয়তো কান ধরে ধরে সব উঠিয়ে দেব।

উঠতে তাদের বয়ে গেছে। মুক্তোপিসিকে জানে—উল্টে পিসির গায়েই জল ছিটাতে লাগল। ক্ষেপে গেছে মুক্তোপিসি, হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুঁড়ছে আর গালিগালাজ করছে, মরিস নে কেন তোরা? মরে যা—হাড় জুড়োক পাড়াটার।

শান্তি বউদি কলসি নামিয়ে রেখে দ্রুত ও ঘাটে গেল। ঠিকই ভেবেছে, তার বাসুও ওর মধ্যে।

পাজি ছেলে—ফুলো কঞ্চি দিয়ে তোমায় আগা-পাস্তলা পেটাব। আয়—আয় উঠে।

উনিশ কুড়ি বছর হতে চলল তো নিশিকান্ত, কিন্তু একেবারে সেদিনের কথা বলে মনে হয়। দেখ—কাঁটাঝিটকের ঝোপে কোন্ জায়গায় ঘাট ছিল বোঝবারই জো নেই, খেজুরগুঁড়িগুলো পচে বর্ষার জলে ভেসে গেছে। কাল শান্তি-বউদি আমার সঙ্গে বলতে লাগল সেই সব দিনের কথা। বলবার কি আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওসব পোড়ো-ভিটে নয়—ভিটের উপর ঘর-দুয়োর মানুষ-জন গরু-বাছুর। এতটুকু বয়স থেকে দেখে এলেছি নিশিকান্ত, সব একেবারে মুখস্থ হয়ে আছে—পুলিসের অত্যাচারে পাড়ার মানুষ ঘরদুয়োর ছেড়ে যেদিন পথে এসে দাঁড়াল, কিন্তু মাথা নোয়াল না—সেই তখন অবধি। চুপ করে দু-দণ্ড বসলে সমস্ত চোখের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কেবল যখন জল এসে দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয় সেই সময়টা ছাড়া। চোখের জলের একটা ওষুধ বাতলে দিতে পার নিশিকান্ত ?

বাসুর কথা বলতে ডেকে বসাই নি কিন্তু। সবাই তা জানে, খবরের কাগজে পর্যন্ত উঠেছে। তোমাদের মীটিঙেও তার সম্বন্ধে কত বক্তৃতা হবে শহীদ পদক দেবার সময়। আমি সেই দলের মধ্যে ছিলাম, সমস্ত জানি। তুমুল কাণ্ড, পাড়ায় পুলিস এসে পড়েছে, পুলিস সাহেব খোদ হ্যামিল্টন সেই দলের প্রথমে। নিরস্ত্র জনতার সামনে ওদের বীরত্বের তুলনা নেই। এই হ্যামিল্টনেরই পাশাপাশি মনে পড়ছে, আর একদিন এক ফোঁটা কানুর সামনে লারমোরের সে কি থরহরি কম্পমান অবস্থা! তার হাতে অস্ত্র ছিল, সেই জন্যই।

সব বাড়ির জিনিসপত্র টেনেটুনে দমাদম রাস্তায় এনে ফেলছিল। নিলাম হবে—কিন্তু খরিদ্দার নেই। সদরে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু গরুর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না স্টেশনে পৌঁছে দেবার, কোন নৌকার মাঝিও নিয়ে যেতে রাজি হয় না। হ্যামিল্টন সাহেবের চোখমুখ আগুনের মতো রাঙা হয়েছে—রোদে পুড়ে

আর রাগের ঝাঁজে। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে। বাড়ি বাড়ি ঝাঁজ-ঘণ্টা বাজাচ্ছে, দাঁত বের করে হাসছে লোকগুলা, আর হ্যামিল্টন ততই ক্ষেপে গিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। নিজের বুকেই বা গুলি করে বসে, এই রকম ভাব। দারোগা-কনেস্টবলরা এখন ভাতের হাঁড়ি ভাঙছে রান্নাঘরে ঢুকে, দুধের কড়াই আঁস্তাকুড়ে আছড়ে ফেলছে, ট্যা-ট্যা করে কাঁদছে ছেলেপিলে, ঝাঁজ-ঘণ্টার আওয়াজে কান্না ডুবে যাচ্ছে। এর উপর আবার উলু দিতে আরম্ভ করল এবার মেয়েরা। মুংলি জিওলগাছে বাঁধা ছিল। একজন চৌকিদার দড়ি খুলে তাকে রাস্তার দিকে নিয়ে চলেচে যেখানে ক্রোক-করা অন্যান্য মালপত্র গাদা করে রেখেছে। আর একজন দমাদম পিঠে লাঠির বাড়ি মারছে যেতে চায় না বলে। মুংলি হাম্বা-রবে ডেকে উঠল।

কোথায় ছিল মুক্তোপিসি—হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। বকনাটা তার। ঘোষাল-বাড়ি গাই দুইত—কাটিঘায়ে গাই মরে গেল, তখন রোগা মরণোন্মুখ বাছুরটাকে সে চেয়ে নিয়েছিল ঘোষাল-গিন্নির কাছ থেকে। তৈলচিক্কন নধর চেহারা এখন মুংলির—মুক্তোপিসি দড়ি ধরে মাঠে সাঠে ঘাস খাইয়ে বেড়ায়, এর-তার বাড়ি থেকে পোয়াল-বিচালি চেয়ে চিন্তে পরম যত্নে জাবনা মেখে দেয়। নিঃস্ব বিধবার সন্তানের মতো হয়েছে ঐ মুংলি।

মুক্তোপিসি বাঘের মতো এসে পড়ল চৌকিদারের উপর।

কোন্ সাহসে মুংলিকে মারিস নচ্ছার হারামজাদারা? মানুষ পিটে পিটে হাতের সুখ বেড়ে গেছে—না? তোদের সাহেব-বাবাকে বল্ গিয়ে, মুক্তো বেওয়া কারো ধেরে খায় নি, আধলা পয়সা টেক্স দেয় না মহারানীকে।

এমনি নির্ভেজাল স্বদেশী গালিগালাজ করতে করতে পিসি একটানে গরুর দড়ি নিয়ে নিল। নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের সে ধার ধারে না। চৌকিদারী ট্যাক্স তাকে দিতে হয় না, একথাও ঠিক। ঘর-বাড়ি নেই, ট্যাক্স ধার্য্য হবে

কিসের উপর? এর বাড়ি ধান ভেনে ওর বাড়ি চিঁড়ে কুটে দিন চালায়। রাত্রে আমাদের কাঠকুটো-রাখা চালাঘরে মাচার নিচে শোয়। মুংলি থাকে আমাদের গোয়ালে।

বিষম সোরগোল উঠল। হ্যামিল্টন ছুটে এসে দেখে, গরু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চৌকিদারের হাত থেকে। বন্দুক তুলল জনতার দিকে—ভয় দেখাতে কি সত্যি সত্যি গুলি করতে, বলতে পারি নে। কিন্তু বাসু এই সময় এক কাণ্ড করে বসল। এটুকু ছেলে, তার সাহসটা বোঝ—পাখির মতো যেন উড়ে এসে হ্যামিল্টনের হাতের বন্দুক কেড়ে নিল। এবার আর দ্বিধা নয়, কোমরের রিভলভার টেনে বাসুর উপর তাক করল সাহেব। আওয়াজ হল, মুখ থুবড়ে পড়ল বারো বছর বয়সের কালো-কোলো ছেলেটা।

দেখলাম মুক্তোপিসিকে। বকনা ছেড়ে দিয়ে এই পুকুর থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল নিয়ে এল। এক বেটা কনেস্টবল পথ আটকাল, পিসি এমন করে তার দিকে তাকাল যে সুড়-সুড় করে সে রাস্তার দিকে চলে গেল! বাসু হাঁ করছিল—মুক্তো পিসি আঁচল নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল তার মুখে। আর সে কি তুমুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি চারিদিকে! এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, একজন কে পালায় নি—বাসুর নির্ভীকতা ঢেউ তুলেচে সকলের বুকের ভিতর। আচ্ছা হ্যামিল্টনের খবর কিছু জানো নিশিকান্ত? ফট ফট করে শিমুলবনে ফল ফাটার সময়ের মতো গুলি চালিয়ে রামদাস মোড়লের বারান্দায় উঠে হাতটা ধুয়ে মোড়ার উপর বসে দিব্যি সিগারেট ধরাল—হিম্মত আছে সাহেবের। এর অনেক দিন পরে জয়রামপুরের এই গণ্ডগোলের ব্যাপারের তদন্ত হয়েছিল, তদন্ত কমিটির সামনেও নাকি খুব চোখা চোখা জবাব দিয়েছিল হ্যামিল্টন।

বাসু পড়ে গেলে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন নি কেন? আপনার লক্কে করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন, ছেলেটা হয়তো বেঁচে যেত তা হলে।

হ্যামিল্টন জবাব দিয়েছিল, সেটা আমার কাজ নয়। গ্রামের লোক ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারত। খুব সম্ভব আমি বাধা দিতাম না…

কলকাতার ইংরেজ-মেয়েরা নাকি অনেক টাকা তুলে ভোজে আপ্যায়িত করেছিল এই হ্যামিল্টনকে, এক বড় সাহেবী ফার্ম থেকে অনেক টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল তার কর্মক্ষমতার জন্য। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচিয়েছিল সে বহু ক্ষেত্রে এমনি বীরত্ব প্রদর্শন করে। একা বাসু নয়—এই রকম অনেক—অনেক নাকি মরেছে তার হাতে। কোথায় আছে আজকাল হ্যামিল্টন বলতে পার? বিলেত চলে গেছে? তার সাধের সাম্রাজ্যের পরিণাম দেখে জানতে ইচ্ছে করে, আজকের দিনে কি ভাবছে সে মনে মনে।

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছি—পাকুড়তলায় তোমরা মিটিং করছ, লক্ষণ মাইতি নিজে হাতে করে সবাইকে মেডেল দেবে। লক্ষ্মণের কাছ থেকে হাত পেতে মেডেল নেওয়া ভারি গৌরবের কথা। শান্তি-বউদি কাপড়-চোপড় ফরসা করে তৈরী হয়ে আছে, এই আজ সকালেও সে বাসুর কথা বলছিল আমার সঙ্গে। সে কাঁদছে না, সত্যি বলছি—অনেক বড় বড় কথা বলছিল, নভেলে যে রকম লেখা থাকে। আচ্ছা—আমাদের জয়রামপুরেই এই সেদিন অবধি যা সব ঘটেছে, সে তো নভেলকে হার মানিয়ে দেয়। সে যুগে আমাদের গোপন আস্তানায় নীলকমল মাস্টার শিখ আর রাজপুতের ইতিহাস থেকে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গল্প শোনাতেন—কোথায় পড়ে থাকে এদের কাছে ইতিহাসের মরা কাহিনী! কত লোকে কতই তো লিখেছে নিশিকান্ত, এই সব সত্যি ব্যাপার নিয়ে তোমরা নভেল লেখ এইবার।

কেবলি অন্য কথা এসে যাচ্ছে। যতীন-দার কথা বলব বলে বসালাম তোমায়। সবাই তাকে ঘৃণা করি। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর উচিত শাস্তি দিয়েছেন—এই কথা বলে বেড়ায় সকলে। বাসুকে যারা মেরে ফেলল,

বাপ হয়ে সেই দলের অত খোশামুদি করা—ঘৃণা হয় না কার বল? বলতে কি—নিজে আমি থুতু দিয়ে এসেছি যতীন-দার গায়ে। থুতু দিয়ে মনে মনে দেমাক হয়েছিল, খুব একটা বীরত্বের কাজ করলাম। যতীন-দা যদি চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে থাকত সেই রাত্রে! শান্তি বউদি তো স্রেফ বেকবুল গিয়েছিল, বাড়ি নেই, যতীন মিস্তিরি, ঘোষগাঁতি কুটুম্বর বাড়ি গেছে।—ওরাও বিশ্বাস করে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় যতীন-দা বেরিয়ে এল। এসে বলে আছি আমি হুজুর। বউ মিছে কথা বলেছে, মনের অবস্থা বিবেচনা করে ওকে মাপ করুন। ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ না হলে—হুজুরেরা বিপদে পড়েছেন, এ সময় মিথ্যে বলে এমন এড়াবার চেষ্টা করে?

সত্যি, যতীন-দা না বেরুলে বৈদ্যনাথ আর সিরাজউদ্দীন সাহেবের সে বিপদের পার ছিল না। পরের দিনও সম্ভবত বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জয়রামপুরে তাঁদের বন্দী হয়ে থাকতে হত। যে সে মানুষ নন সিরাজউদ্দীন-বৈদ্যনাথ—হ্যামিল্টনের ডান-হাত বাঁ-হাত। কে ডান-হাত আর কে বাঁ হাত ঠিক করে বলা শক্ত—এ নিয়ে কিছু রেশারেশিও ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী কাজের সময় একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। মীটিঙে বৈদ্যনাথকে দেখতে পাবে নিশিকান্ত, স্বাধীনতালাভের পর থেকে বিষম গান্ধিভক্ত হয়েছেন—গান্ধি-টুপি মাথায় দিয়ে খোঁড়া পায়ে তদারক করে বেড়াচ্ছেন, অনুষ্ঠানের অন্যতম মাতব্বর তিনি। আর স্বাধীন-ভারত চোখে দেখবার জন্য বেঁচে নেই যে সিরাজউদ্দীন—থাকলে তিনিও নিশ্চয় দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতেন এমনি কোনখানে।

একেবারে রাস্তার উপর ঐ যে ক'টা ভিটে—ঐ ছিল আমাদের বাড়ি। আমার আর যতীন-দার ঘর এক উঠোনের দক্ষিণ পোঁতা আর পশ্চিম পোঁতা।

সম্পর্কে আমরা ভাই হই। ঘরে শুয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়, তা পর্যন্ত কানে পৌঁছয়।

বাসু মারা পড়ল, তারপর কি হল শান্তি-বউদির—চল্লিশের কাছে, তবু একেবারে নূতন বউয়ের অধম হয়ে উঠেছে। যতীন-দাকে নিয়ে সদাই ব্যস্ত—কোলের ছেলেটার প্রতিও তেমন আর মনোযোগ নেই। রাতে ভাল করে ঘুমুতে পারে না, ঘন ঘন উঠে বসে, যতীন-দার কোঁচার খুঁটের সঙ্গে শাড়ির আঁচল বেঁধে রাখে। তাতেও সোয়াস্তি নেই, যদি কোন ফাঁকে খুট খুলে উঠে গিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে আবার ভালমানুষ হয়ে এসে শুয়ে থাকে! দরজা বন্ধ করে শোবার আগে একটুকরো কাগজ চুপিচুপি হুড়কোর সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, যতীন-দা লুকিয়ে যদি হুড়কো খুলে বেরোয়, অজ্ঞাস্তে কাগজের টুকরো পড়ে যাবে নিশ্চয়। সকালবেলা শান্তি-বউদি মেজেয় ঠাউরে ঠাউরে দেখে, বেরিয়ে যাবার চিহ্ন আছে কিনা কোথাও। ঘুমন্ত যতীন-দার পায়ের তলা দেখে, পা ধুয়ে শুয়েছিল—রাতে বেরিয়ে থাকে তো ধুলো-মাটির দাগ আছে। নানা কৌশল করেও শান্তি-বউদি আবিষ্কার করতে পারে না স্বদেশী দলের সঙ্গে যতীন-দার যোগাযোগ আছে। রাগ বেড়ে যায় আরও নিজের উপর, রাগ হয় ঘুমের উপর। জেরা করে যতীন-দাকে, হঠাৎ বা ক্ষেপে উঠে গালিগালাজ শুরু করে দেয়।

বেরিয়েছিলে তুমি। ঐ ও-ঘরের চারু বললে যে! মিথ্যুক তুমি—মিথ্যে বলে আমাকে ভুলোও।

চারু আমার স্ত্রী। বউমানুষ—তার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, যতীন-দা ভাদ্রবধূ-সম্পর্কীয়ার সঙ্গে কথাটা আস্কারা করতে যাবে না—শান্তি-বউদি তাই অবাধে তার নামটা করে দিল। চারু এঘরে শুনতে পেয়ে রাগ করে।

দেখ কাণ্ড! ভাসুর ঠাকুরের কাছে তাহা মিথ্যে লাগাচ্ছে আমার নামে।

অনেক করে চারুকে আমি ঠাণ্ডা করি। শান্তি-বউদি এমনি সব জলজ্যান্ত সাক্ষী-সাবুদের নামোল্লেখ করত—ভাঁওতা দিয়ে যতীন-দার মুখ থেকে আদায় করতে পারে যদি কিছু। কিন্তু কিছুই পারে না, শান্তি-বউদি ক্ষেপে যায় আরও; চোখ দিয়ে যেন অগ্নি-জ্বালা ছিটকে বেরোয়। বাইশ-তেইশ বছর এক সঙ্গে ঘর করার পর শেষকালে ওদের দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে একেবারে।

একদিন রাত একটা-দেড়টা হবে তখন নিশিকান্ত, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। অনেকগুলো মানুষ এল আমাদের উঠানে দুমদাম করে, তারা যতীন-দার দাওয়ায় উঠল।

যতীন, যতীন মিস্তিরি!

আমি আর আমার গা ঘেঁষে চারু—জানলার একখানা কবাট খুলে উঁকি দিচ্ছি। যা ভেবেছি, থানার মানুষ—সেই পোশাক, সেই চালচলন।

শান্তি-বউদি বলল, না—বাড়ি নেই তো উনি।

দোর খুলে সঙ্গে সঙ্গে যতীন-দা বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নার আলোয় আমরা দেখতে লাগলাম।

ইদিকে এস তো মিস্তিরি, দেখে যাও—

ভাষাটা অনুরোধের, কিন্তু হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে গেল যেন সে খুনী আসামী। সবাই উঠানে নেমে এসেছি। যতীন-দার আগে পিছে জন-আষ্টেক কনেস্টবল—হাতে দাড়ি দেয় নি এই যা—হাত ধরে দ্রুত নিয়ে চলেছে।

তা হলে বোধ হচ্ছে যতীন-দা একটা কিছু করে বসেছে গোপনে গোপনে আমরাও যা জানিনে—শান্তি-বউদির সন্দেহ মিথ্যা নয় একেবারে। রাত থমথম করছে। এ অবস্থায় এখন কি করব ভেবে পাই নে। রামদাস

কাশছে ওদের টিনের ঘরে, কাশির আওয়াজ বিশ গুণ হয়ে বাইরে আসে। শান্তি-বউদি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

রামদাস হাঁক দিচ্ছে, ও যতীন, হল কি? কান্না কেন তোমাদের বাড়ি?

একজন দুজন করে ভিড় জমে গেল। রামদাস জিজ্ঞাসা করে, কি করেছিল বল তো? করেছে নিশ্চয় কিছু—নইলে শুধু শুধু ধরতে যাবে কেন? বুকের জ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিল, বাইরে কিছু টের পাওয়া যায় নি—

আ-হা-হা! বলে সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলে কাশতে কাশতে রামদাস বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু নিয়ে গেল কোথায় এইরাত্রে? এগিয়ে মোড় অবধি গিয়ে দেখি, ফিরে আসছে। সঙ্গে অনেক পুলিস। খানাতল্লাসি করতে সঙ্গে নিয়ে আসছে নাকি?

যতীন-দা আগে আগে—দলসুদ্ধ সে রামদাসের বাড়ি নিয়ে তুলল। ডেকে বলে, রাত্তিরটুকু সিরাজউদ্দীন সাহেব এইখানে থাকবেন। বদ্যিনাথবাবু আর সিরাজউদ্দীন সাহেবের নাম শুনেছ—এই যে এঁরাই। বনবিষ্টুপুর চলেছেন। টিনের বেড়া-দেওয়া ভাল ঘর—তাই তোমার এখানে ব্যবস্থা করলাম। দোর খুলে দাও শিগগির, বিছানাপত্তোর কি আছে নিয়ে এস।

হাঁকডাক বাড়িসুদ্ধ তোলপাড় করে তুলেছে। সেই কাণ্ডের পর থেকে হ্যামিল্টন আর সদর ছেড়ে এখানে আসে না। হয়তো বা সদরই ছেড়েছে। ইতিমধ্যে এই দুইজনের নাম জেলাময় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জয়রামপুরে শুভাগমন হয়েছে—মহাপ্রভু দু'টিকে একবার চোখে না দেখে পারি নে। গাবতলায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি। যতীন-দা তখন বলছে, খাওয়া-দাওয়ার কি হবে হুজুর? ভাত চলবে, না লুচি-টুচি?

বৈদ্যনাথ তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বললেন, এখন আর হাঙ্গামে দরকার নেই মিস্তিরি, ভরপেট আমরা খাবার খেয়ে রওনা হয়েছি—

সে কি কথা হুজুর, কত ভাগ্যে অতিথি হয়েছেন আমাদের পাড়ায়! ঘাড় নেড়ে আরও জোর গলায় বলল, আজ্ঞে না, সে হবে না—কক্ষনো হতে পারে না—

সিরাজউদ্দীন দেখি চোখ কট-মট করছেন বৈদ্যনাথের উপর। বিপুল দেহ —ভাব দেখে মনে হয়, নিদারুণ খিদে পেয়েছে। বৈদ্যনাথ ফিসফিস করে তাঁকে কি বললেন। কি বললেন না শুনেও আন্দাজ করতে পারি। মনে মনে বেশ জানেন, লোকে কি চোখে দেখে ওঁদের! রাত্রিবেলা অজানা জায়গায় খাবারের সঙ্গে বিষ-টিষ মিশিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়।

বৈদ্যনাথ বললেন, কাজকর্ম চুকে যাক—সময় থাকে তো বরঞ্চ সকালবেলার দিকে দেখা যাবে। পার তো আমাদের সিরাজউদ্দীন সাহেবকে একটা ডাব খাইয়ে দাও। শোবার আগে ওঁর ডাবের জল খাওয়া অভ্যাস। আর ধকলটা কি রকম দেখছ তো—সকলেরই তেষ্টা পেয়ে গেছে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—অভ্যাস হয়ে গেছে যখন সাহেবের—

সেই দুপুর রাত্রে লোকাভাবে নিজেই যতীন-দা নারকেলগাছের মাথায় চড়ে কাঁদির পর কাঁদি কাটল, নেমে এসে ডাব কেটে কেটে ওদের সামনে ধরতে লাগল। শাঁসে-জলে পুরো এক গণ্ডা নিঃশেষ করে সিরাজউদ্দীন সাহেব তবে শান্ত হলেন। বৈদ্যনাথ খেলেন একটি মাত্র—তাও শুধু শাঁস। সর্দির ধাত, রাত্রি জেগে তার উপর কাজের তদারক করতে হবে—ডাবের জল সহ্য হবে না এ অবস্থায়।

অবাক হয়ে যতীন-দার কাণ্ড দেখছি। ঐ কনেস্টবলগুলোর কেউ কেউ হ্যামিল্টনের পাশে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে পারলাম। যতীন-দা ডাব কেটে সকলের মুখে ধরছে। তারপর সিরাজউদ্দীন দালানের দরজা দিলেন,

জানলার প্রত্যেকটি কবাট এঁটে পরখ করে দেখলেন, একটা কনেস্টবল সশস্ত্র মোতায়েন থাকতে হুকুম দিলেন দোরগোড়ায়।

এই সব চুকিয়ে আসতে যতীন-দার দেরি হচ্ছে। অনেক—অনেক দেরি। শান্তি-বউদি তার অপেক্ষায় হুড়কোর ধারে দাঁড়িয়ে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, আঁচলটা তুলে দিয়েছে মাথায়। আমি অভয় দিচ্ছি, কিছু ভাবনা নেই বউদি, যা খোশামুদি করছে দেখে এলাম—

যতীন-দা আসতেই শান্তি-বউদি এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। আমি রয়েছি, তা বলে সঙ্কোচ নেই। এক্ষুনি যেন সে পালিয়ে যাবে, এমনি ভাবে ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

যতীন-দা বলে, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘা লেগে ওদের মোটরটা জখম হয়েছে। মুশকিলে পড়ে গেছে। আমায় ঠিক করে দিতে বলল।

শান্তি-বউদির মুখের উপর হাসি চিক-চিক করে উঠল এতক্ষণে। যতীন দার দিকে চোখদুটো তুলে বলে, গাড়ি এমন করে দাও, কক্ষনো আর না চলে—

যতীন-দা সবিস্ময়ে বলে, তুমি বলছ এই কথা? রাত-দিন ঝগড়াঝাঁটি করে মরছ—ছেলে গেছে, আবার আমি যাতে গণ্ডগোলের মধ্যে না যাই—

তা বলে গোলামি নিতে বলেছি ওদের?

ভালই তো! তুমি নিশ্চিন্ত, আমিও—

শান্তি-বউদি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল যতীন-দার। যতীন-দা হাসতে লাগল। হাসি আমারও বিশ্রী লাগছিল! শান্তি-বউদি ফিরেও আর না চেয়ে দাওয়ায় উঠে গেল। এদের প্রতি রাত্রের দাম্পত্য কলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, আজকে চুপচাপ। শান্তি-বউদি কথাবার্তাই বন্ধ করেছে। ভাবলাম, বেশ হয়েছে—রাতটুকু নিরুপদ্রবে ঘুমানো যাবে।

কিন্তু ঘুমানো গেল না আর এক কারণে। চারু আমার গা ঝাঁকাচ্ছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকছে, ওঠ—ওঠ, আগুন লেগেছে—

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল আলোকিত আকাশ। উঠানে লাফিয়ে পড়লাম। যতীন-দাও উঠেছে, টেমি জ্বেলে দাওয়ায় নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করে হুঁকো টানছে।

দেখতে পাচ্ছ না ?

যতীন-দা বলল, হাঁ, আমায় ডেকে তুলে দিয়ে গেল—কাজে লাগব এইবার। তার আগে বুদ্ধির গোড়ায় একটুখানি ধোঁয়া দিয়ে নিচ্ছি।…আরে আরে—তুই চললি কোথা ?

রূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে এক নজর চেয়ে ছুটলাম। যখন ফিরে আসছি, দেখি—যতীন-দা গজেন্দ্রগতিতে চলেছে।

জান ? আগুন লাগিয়েছে ওরাই।

যতীন-দা হা হা করে হেসে উঠল। বুদ্ধি করেছে ভাল। চাঁদ ডুবে গেছে, কোথায় কার বাড়ি লণ্ঠন খুঁজে বেড়াবে ? জোরালো আলোয় মোটর মেরামত হবে, আর আঁধারে-আঁধারে নোনাখোলায় আবার কেউ আইনভঙ্গ করতে না পারে—তারও পাহারা দেওয়া চলবে।

ভলাণ্টিয়ারদের চালা পুড়ছে।

সে-ই তো ভাল রে! তোর আমার ঘর পুড়ল না, এক তিল জিনিসের অপচয় হল না। ওদের তো এক একটা গামছার পুঁটলি সম্বল—সেইটে বগলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চালার আগুনে খানিকক্ষণ গা-হাত-পা সেঁকে নিয়ে আর কোনখানে সরে পড়ুক।

আবার বলে, বদ্যিনাথবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে গেল। বনবিষ্টুপুরে

হাট জমবার আগে দলবল সুদ্ধ গিয়ে পড়তে হবে বিলাতি কাপড় আর মদের দোকান সামাল দিতে। গাড়ি তাড়াতাড়ি সেরে দিতে হবে।

তখনও ভাবছি, মুখে যা-ই বলুক—বয়ে গেছে যতীন-দার গাড়ি মেরামত করে দিতে! দায়ে পড়ে স্বীকার করেছে, যা হোক একটা জবু-থবু করে দেবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বেলা না উঠতেই খবর নিয়ে এল, বিগড়ান ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে আবার। মায়াবী যতীন-দা—কলকব্জা যেন তার পোষা জানোয়ার—হাতের একটু স্পর্শ কি দুটো থাবড়া খেলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবেগে অমনি কাজে লেগে যায়।

বৈদ্যনাথ ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছিলেন। যতীন-দার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকালেন।

সাবাস! খুব বাহাদুর তুমি মিস্তিরি—

দশ টাকার নোট একখানা বের করলেন। দু-হাত পেতে বকশিশ নিয়ে যতীন-দা মাথা নিচু করে নমস্কার করল।

পুলকিত বৈদ্যনাথ সিরাজউদ্দীন সাহেবকে খবর দিতে ছুটলেন। ফিরলেন তখনই। বললেন, এদিকে তো হল—বিপদ হয়েছে এখন ড্রাইভারকে নিয়ে। তার বেশি লাগে নি ভেবেছিলাম, এখন দেখছি হাঁটুর মালা ফুলে গোদ হয়েছে, পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে বেটা। ইয়ে হয়েছে, ড্রাইভ করতে নিশ্চয় জান তুমি মিস্তিরি—

যতীন-দা বলল, খাস কলকাতার লাইসেন্স আমার হুজুর। বারো বছর এই লাইনে বাস চালিয়ে এসেছি, সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এখন এইসব গণ্ডগোলে লাইন বন্ধ—আর ধরুন গে, সেই আমার ছেলের ব্যাপারের পর মন-মেজাজও ভাল ছিল না—

এ সমস্ত আমাদের চরের মুখে শোনা। শুনে রাগে ফুলতে লাগলাম।

রওনা হতে কিন্তু ওদের দেরি হয়ে গেল। সিরাজউদ্দীন একেবারে বেঁকে বসলেন, রাতে উপোস গেছে—খাওয়া-দাওয়া না করে এক-পা নড়বেন না এ জায়গা থেকে। বনবিষ্টুপুর গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, ঠিক কি? আর এখানে ভূরিভোজনে অসুবিধাও কিছু নেই, সিকি পয়সা খরচও হবে না। ক্ষেত থেকে খুশীমতো তরকারি তুলে আন, চাল-ডাল হুকুম কর যে কোন গৃহস্থের বাড়ি, মাছ খাবার ইচ্ছে হলে যে পুকুরে ইচ্ছা জাল নামিয়ে দাও—মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করবার গরজ নেই কারও কাছে। সিরাজউদ্দীনের যুক্তি সবাই প্রণিধান করল, রামদাসের গোয়ালঘরে উনুন খুঁড়ে কনেস্টবলরা রান্না চাপাল। রাজসিক ব্যাপার—এর ওর বাড়ি থেকে ডেগচি-কলসি থালা-বাসন চেয়ে নিয়ে এসেছে।

যতীন-দা এক ফাঁকে বাড়ি এসে বলল, আর ভয় রইল না তো তোমার! গোলমাল যদি কিছু হয়, থানায় খবর দিও—থানাসুদ্ধ ছুটে আসবে দেখো আমার খাতিরে। ওঁরাই মুরুব্বি হলেন আমাদের, সুনজরে দেখেছেন।

শান্তি-বউদি তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

দেখছি, আর রাগে ফুঁসছি আমরা। গাড়ি ঘাটের ধারে এইখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে। পেট্রোলের খালি টিনে জল এনে ইঞ্জিনে ঢালছে। গর্জন করছে ইঞ্জিন, আক্রোশে কাঁপছে থরথর করে, যেন এক বিপুলকায় দৈত্য নখ-দাঁত উদ্যত করে তৈরি হয়েছে। ক্রোশ চারেক দূরে বনবিষ্টুপুরের গঞ্জে রুক্ষ-চুল বিবর্ণ-দেহ ছেলেমেয়ের দল দোকানের পথের উপর শুয়ে পড়ে আছে—মহাজাতির নৈতিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না কোনক্রমে, আর দেশের সম্পদ নিয়ে যেতে দেবে না সমুদ্রপারে, অমোঘ সঙ্কল্প আর আত্মপ্রত্যয় জনে জনের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় রেখায়—সেইখানে ছুটে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরতে হবে তাদের। পলকে রক্তাক্ত হয়ে যাবে গঞ্জের পথমৃত্তিকা।

আর দেখ, ষ্টিয়ারিঙের চাকা ধরে বোধ করি আমাদের দিকেই চেয়ে কি-রকম হাসছে যতীন-দা!

মাথার মধ্যে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল, আমি থাকতে পারলাম না নিশিকান্ত। দৌড়ে যতীন-দার কাছে গিয়ে থুতু দিলাম তার গায়ে। হৈ-হৈ রব উঠল। বৈদ্যনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, জাপটে ধরল আমায় তিন-চারটে কনেস্টবল, দু-চারটে কিল-চড়ও খেলাম। যতীন দা তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিল।

আমার খুড়তত ভাই হয়! আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। আমি একদিন জিওলের ডাল দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে পিটেছিলাম, তারই কিছু শোধ দিয়ে গেল। আপনাদের কোন ব্যাপার নয়। ছেড়ে দিতে বলুন।

ওদের হাত-থেকে ছাড়িয়ে দিল, বাঁচিয়ে দিল—তা বলে কৃতজ্ঞতা বোধ করি নি নিশিকান্ত। এটুকু লাঞ্ছনা ভাত-কাপড়ের সামিল আমাদের, এতে মন খারাপ হয় না, ফাঁক কাটাতে পারলে আনন্দও হয় না তার জন্য। মোটর বেরিয়ে গেল ভকভক করে পিছনের নলে ধোঁয়া ছেড়ে—যেন উপহাস করে আমাদের। যতীন-দা হাসতে হাসতে গেল। হাত নিসপিস করছিল—থুতুতে কি হবে, থুতু গায়ে লাগে—মন অবধি পৌছয় না ওদের। থুতু না দিয়ে অন্তত একটা ঘুসি যদি ঝেড়ে দিতাম, তাহলেও গায়ের ব্যথা মরতে একটা দিন সময় লাগত, কিছু পরিমাণে শান্তি হত।

তা আমাদের হাতে না হোক, শাস্তি এড়াতে পারল না যতীন-দা, ভয়ানক শাস্তি—আমরা এর সিকির সিকি কল্পনা করতে পারতাম না। দিন কয়েক পরে খবর এল, যতীন-দা মারা গেছে। এখান থেকে ক্রোশ চারেক দূরে ন-হাটা বলে গ্রাম—সদলবলে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছে সেখানে। গাড়ি নিয়ে পুলের উপর উঠতে গিয়ে উলট-পালট খেতে খেতে একেবারে খালের গর্ভে।

দিন দুপুর—তামাক ছাড়া কোন রকম নেশাও করত না যতীন-দা—কেমন করে কি হল, সঠিক কেউ বলতে পারে না।

গরুর-গাড়ি করে শান্তি-বউদিকে নিয়ে গেলাম ন-হাটায়। কোল-মোছা ছেলেটাকে বুকে করে শান্তি-বউদি চলল আমার সঙ্গে। বৈদ্যনাথও ছিলেন যতীন-দার সেই গাড়িতে, তারপর হাসপাতালে গেছেন। প্রাণে বেঁচে যাবেন, কিন্তু একখানা পা কেটে ফেলতে হয়েছে, খোঁড়া অবস্থায় ল্যাং-ল্যাং করতে হবে চিরকাল। রজনী দফাদার যতীন-দার পাশে ছিল, কপাল জোরে প্রায় অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচেছে। সে বলতে লাগল, কাঁধে যেন ভূত চেপেছিল মিস্তিরির। গাড়ি ছুটছে—জোর দিচ্ছে, কেবলি জোর দিচ্ছে, হু-উ-উ-উ করে আওয়াজ হচ্ছে—ভাবতে গা শির-শির করে মশায়, আর ঐ যে হাসত কথায় কথায়—সেই রকম হাসতে লাগল চাকায় হাতটা রেখে। আমি বলছি, সামাল মিস্তিরি—পুল ঐ সামনে, অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হবে। বলতে বলতেই গাড়ি পাক খেয়ে পড়ল। নিতান্ত গুরুবল ছিল—আমি লাফিয়ে পড়লাম। তারপর উঠে দেখি আগুন ধরে গেছে, দাউ-দাউ করে জ্বলছে গাড়ি, পেট্রোলের গন্ধ আর কালো ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়—

যতীন-দাকে দেখলাম—বলে দিল, তাই ধরে নিলাম এই যতীন-দা। আধপোড়া বীভৎস মূর্তি—মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। পুলিশের দল ন-হাটার কাজ চুকিয়ে বিদায় হয়ে গেছে, বৈদ্যনাথকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার তাগিদেই এত তাড়াতাড়ি তারা গ্রাম ছেড়েছে। মানুষজন পাওয়া গেল না—যারা গ্রাম জব্দ করতে এসেছিল, কে আসবে বল তাদের মড়া পোড়াতে? আড়ালে খুব তারা হাসাহাসি করছে, অনুমানে বুঝলাম। কাঠ-কুটোরও জোগাড় হল না। রজনী দফাদারের

সাহায্যে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে খালের কলমিদামের নিচে কোন গতিকে ঠেসে দিলাম মৃতদেহ। আর একটা ব্যাপার নিশিকান্ত—শান্তি-বউদি চোখের উপর সমস্ত দেখল, যতই হোক স্বামী তো! কিন্তু একটু বিচলিত হতে তাকে দেখলাম না, একবিন্দু চোখের জল পড়ল না।

রাত দুপুর অবধি গলদ্‌ঘর্ম হয়ে চুকিয়ে-বুকিয়ে এলাম। রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা ফিরে যাচ্ছি। খাল-ধার দিয়ে পথ। দেখি শিয়ালে এরই মধ্যে ডাঙায় তুলেছে, কুকুর আর শকুনে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। জেলের মধ্যে এই ছবি মাঝে মাঝে আমার মনে উঠত, আর বড় কষ্ট হত নিশিকান্ত। হোক দেশদ্রোহী—বাসুর বাবা আমাদের যতীন-দা তো!

কত দিনের ঘটনা এসব! তারপর অনেক বয়স বেড়েছে, বুড়ো হয়েছি। এখন নূতন করে ভাবি সেই সব সে কালের কথা। দুঃখ হয় যতীন-দার জন্য। সর্বনন্দিত হয়ে সে মারা গেল। মরেও নিষ্কৃতি নেই, শবদেহ ছিঁড়ে খেল শিয়াল-শকুনে। জেলের মধ্যে হঠাৎ একদিন মনে উঠল, মতলব করে মরে নি সে তো? ঘুঘু-বৈদ্যনাথটাকে নির্ঘাৎ সঙ্গে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু তা হবে কেন? আগস্ট-আন্দোলনের সময়ে এই জয়রামপুরেই আর এক দফা ইংরেজের নিমকের মর্যাদা রেখে সরকারি মেডেল পাওয়া এবং স্বাধীনতা-লাভের মুখে সেই মেডেল প্রত্যর্পণ করে দেশপ্রেমী রূপে মাতব্বরি করা তাঁর ভাগ্যের লিখন—শুধু একটা পা খুইয়ে তিনি বেঁচে রয়ে গেলেন। গান্ধিটুপির নিচে পূর্বতন সকল দুষ্কৃতি চাপা দিয়ে সভায় ঘোরাঘুরি করতে দেখবে বৈদ্যনাথকে। রিটায়ার করবার পর এখনো জয়রামপুর আঁকড়ে আছেন। প্রফুল্লর ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরই মন্ত্রণামতো চলে—তাঁর বড় মুরুব্বি প্রফুল্ল।

কিন্তু আমার সন্দেহ যাচাই করি কার কাছে নিশিকান্ত? গোপন অভিপ্রায় কাউকে তো বলে যায় নি যতীন-দা। তোমাদের উৎসব-সভায়

ভুলেও কেউ তার নাম করবে না। আর দৈবাৎ যদি উঠে পড়ে, সমস্ত শ্রোতা —শান্তি-বউদি অবধি লজ্জায় মুখ ফেরাবে।

এই যে সভার জায়গা। পৌঁছলাম এতক্ষণে। খাসা সাজিয়েছে! প্রফুল্লর কাজে খুঁত থাকে না, বরাবর দেখেছি। পাকুড়গাছ শাখা বিস্তার করে আছে, রোদ লাগবে না মানুষ-জনের গায়ে! শেয়াকুল আর ভ্যাড়াসেজির ঝাড় সাফ-সাফাই হয়ে গেছে; স্বাধীন-ভারতের নিশান টাঙিয়েছে ইস্কুল-বাড়ির সামনে। এই ইস্কুলে পড়েছি আমরা, আমাদের নীলকমল মাস্টার মশায়ের স্মৃতিপবিত্র ইস্কুল। আমাদের ছেড়ে কোথায়. চলে গেলেন মাস্টার মশায়, তারপর আর কোন খবর পাই নি। হয়তো কোন গ্রামপ্রান্তে সকলের অজান্তে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন তিনি। আরও কত জনে এমনি গেছেন।

বিয়াল্লিশ সনে আট-দশ গ্রামের মানুষ মিলে এক নিশান বেঁধে দিয়েছিল ঐ ইস্কুল-বাড়ির ছাতে। সে নিশান কিন্তু এত বড় ছিল না, আর উড়েছিল বড় জোর পাঁচটা কি ছ'টা দিন। সেবারের পরাহত পতাকা দেখ নিশিকান্ত, প্রসন্ন আলোয় মাথা তুলে হাসছে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে।

লক্ষ্মণ মাইতি সভাপতি—তার জায়গা তক্তাপোশের উপর? তবেই হয়েছে! খুব ভাল জানি তাকে, ক্লাসে পাঁচ বছর পাশাপাশি বসে পড়েছি। খ্যাপাটে মানুষ—চিরকালের ধর্মভীরু। পরমহংসদেবের মানস-শিষ্য—ঠাট্টার ছলেও একটা মিথ্যা কথা বলে না। লক্ষ্মণের ছেলে প্রভাস—বাপের ছেলে সে, বাপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সদাচারণে। বাপ বা ছেলে—কোন দিন ওদের উঁচুতে বসতে দেখি নি দশজন থেকে আলাদা হয়ে। লক্ষ্মণ কিছুতে বসবে না দেখো ঐ উঁচু সভাপতির আসনে।

শহীদ-বেদি ঐ? বেদির গায়ে নাম লেখানো হচ্ছে কেন বাহাদুরি করে? ক'টা নাম জান, কতটুকু খবর রাখ? আমাদের যতীন-দার নাম লিখবে কি

বেদির উপর? দুর্গা আর নীলকমল মাস্টার মশায়ের নাম? আদিকাল থেকে প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কত জনে প্রাণ দিয়েছে—আমাদের এই এক জয়রাম-পুরের কথাই ধর না—সংখ্যায় তারা কি একজন-দু'জন? নিজেরাই জানত না, সভ্যতার রথরজ্জু টানছে তারা, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও মমতা সঞ্চয়ন করছে উত্তরপুরুষের জন্য। আজকে ঐ স্বাধীন-পতাকার নিচে শুভ্র খদ্দরে ঢাকা বেদি-গাত্র থেকে কতজনের স্থান চ্যুতি ঘটবে—তার চেয়ে নাম একটাও লিখো না তোমরা, লিখে রাখ—'সর্বযুগের শহীদজনের স্মৃতিতে'।

অত ফুল—শহীদ-বেদিতে ঢালবে? কিন্তু কতক্ষণ থাকবে বল নিশিকান্ত? বাতাসে ঝুরঝুর করে পাকা পাতা ঝরে তোমাদের ফুলসজ্জা তলিয়ে দেবে। এই তো ক'বছর আগে রক্তের ছোপে রাঙা হয়েছিল ওখানটা। আরও কতবার রক্তে ভেসেছে আমাদের দেশ—আমাদের এই গ্রামটুকুও। সারা দেশের মাটি খুঁজে দেখ, এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই কোনখানে। লোকের মনে একটু-আধটু যা আছে, তা-ও মিলিয়ে যাবে আর কয়েক বছরে বিপুল জীবনোল্লাসের মধ্যে। দোষ দিই না—স্বাধীন দেশের ভাগ্যবান নরনারী, সামনে এগোবার তাগিদ—পিছন ফিরে নিশ্বাস ফেলবার সময় কতটুকু?

শপ এনে এনে জড় করছে। শপের কি দরকার? শুকনো পাতা স্তূপাকার হয়ে আছে—ওরই কতক এনে ছড়িয়ে দাও, গদির মতো হবে, দিব্যি আরাম করে সকলে বসবে। কতদিন আমরা পাতার বিছানায় ঘুমিয়েছি—সে জায়গা দেখিয়ে এলাম নিশিকান্ত। প্রভাসের কথা ভাবছি। প্রভাস—আমাদের প্রভাস মহারাজ! ইস্কুলের মাঠে উৎসব-সভা—এমন দিনে সে নেই! এই মাঠ থেকে একদা নিশিরাত্রে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সঙ্কল্প নিয়ে পথে পথে বেরিয়েছিলাম আমরা, প্রভাস আর ফেরেনি। কাঠখোট্টা চেহারা, কদম-ছাঁটা চুল, গেরুয়া পরত না বটে—কিন্তু হাঁটুর নিচে

কখনো কাপড় নামতে দেখি নি, বছর পনের নিরামিষ ধরেছিল, তার মধ্যে নুন ছুঁত না বছর পাঁচেক—ছেলেরা প্রভাস মহারাজ বলে ডাকত। কিন্তু মনে তার স্ফূর্তির জোয়ার—সেই ফেরারি অবস্থায় মসগুল করে রাখত সে সকলকে। একটুকরো বাঁশের গোড়া আতার ছোটায় বেঁধে ঝুলিয়ে দোলনার মতো করে নিয়েছিল আমাদের বাঁশবনের আশ্রয়ে। যেদিন পেটে ভাত পড়ত না, দোল খাওয়ার শখ বেড়ে যেত প্রভাসের সেই দিন।

পোড়া ইস্কুল-ঘরে আজ কত মানুষের আনাগোনা! এ দালান পুড়িয়ে দিয়েছিল সেবার। দরজা-জানালা পুড়ে গিয়ে ঘর হা-হা করত, আবার তার চেহারা ফিরেছে। এক পাশে বিজলী-ডাক্তার খাবার জল আর তুলো-আইডিন নিয়ে হাসপাতাল সাজিয়ে বসে আছে আজকের দিনটার জন্য। পাশের ঘেরা-বারাণ্ডায় একটুখানি বিছনা করা আছে, সভাপতি লক্ষ্মণ যদি বিশ্রামের দরকার মনে করে এতদূর এসে পৌছবার পর। বুড়োমানুষ, তার উপর শরীরের এই হাল—লোকে নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলেই সভা করে বেড়াতে হচ্ছে এখানে-ওখানে। কি দেখেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়, কিম্বা লক্ষ্মণের জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর! তার নামে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও মানুষজন ভোরবেলা চাল-চিঁড়ে নিয়ে বেরিয়েছে। বক্তৃতা করতে পারে না লক্ষ্মণ, দুটো কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে কালঘাম ছুটে যায়, অ্যাঁ-অ্যাঁ করে। সেই সময় পাশ থেকে কথা জুগিয়ে দিতে হয়। অথচ তার এত জনপ্রিয়তা! কিন্তু এবারে উবে গেল নাকি? প্রফুল্ল-বৈদ্যনাথেরা বিশেষ উদ্যোগী বলেই হয়তো মানুষজনের চাড় দেখা যাচ্ছে না তেমনি। কিন্তু প্রফুল্লও ছাড়বার পাত্র নয়, হাজির করবে দেখো সকলকে ঠিক সময়ে। হাত ধরবে মাতব্বরদের, না আসে তো ট্যাক্স বাড়াবার ভয় দেখাবে। কাজকর্ম ফেলে মীটিঙে ছুটতে দিশা পাবে না তখন চাষীরা। আজই

সকালবেলা রামদাস তুলেছিল এই প্রসঙ্গ। আমি তাকে উপদেশ দিলাম, কান খাড়া রেখো, শঙ্খ বাজবে লক্ষ্মণের গলায় মালা দেবার সময়। তখন গিয়ে হাজির হোয়ো—তা হলে চলবে।

লক্ষ্মণের সঙ্গে এবার একই দিনে আমি জেল থেকে বেরোই। গাঁয়ে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—কোন জায়গায় ঘর-বাড়ি ছিল, চিনে উঠতে পারে না। আর আমার ঠিক উল্টো অবস্থা—চারিদিকে খাঁ-খাঁ করছে, তবু সমস্ত যেন জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সেই আগের মতোই তারা চলে ফিরে বেড়ায়। যতীন-দাকে দেখি, কানুকে দেখি, প্রদীপ্তমুখ প্রভাস মহারাজকে দেখতে পাই। জেলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। রোগের শেষ যায় নি, এখনো অনেকের সন্দেহ। আমি কিন্তু নিজে কোন রোগের লক্ষণ একবিন্দু টের পাই নি। অতীতের প্রিয় মানুষগুলি রাতদিন যেন আমায় ঘিরে বসে থাকত, ভারি আনন্দে ছিলাম। বরং মনে হয়, পাগল ঐ বুড়ো লক্ষ্মণ। কোন দিন ওর রোগ নিরাময় হবে না। দেখলে মনে হবে, অমন সুখী লোক ভূ-ভারতে নেই। জেল থেকে বেরিয়ে ঘর সে আর নূতন করে বাঁধল না। বললে হাসে। হেসে হেসে বলে, কি দরকার বল ভাই? কথা মিথ্যা নয়—ঘরের কি দরকার লক্ষ্মণ মাইতির? নিজে তো আজ এখানে কাল সেখানে—এই করে বেড়াচ্ছে। বউ জলে ডুবে মরেছে, জলের তলে জ্বালা জুড়িয়েছে হতভাগীর। দুটি ছেলের মধ্যে প্রভাস ফাঁসিতে গেছে, আর একটি জেল থেকে নানা জটিল রোগ নিয়ে এসেছে—হাসপাতালের একরকম কায়েমি বাসিন্দা তাকে বলা যায়। লক্ষ্মণ কেন মিছে ঘর-বাঁধার হাঙ্গামা করতে যাবে?

প্রভাসের কথা শোন। বারটা মনে আছে—বিষ্যুৎবার। হাট বসেছিল সেদিন, হাটবার ছিল—তাই মনে আছে বারটা। সকালবেলা টিপ-টিপ করে

বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রভাসকে ধরল, হাত-পা বেঁধে নিয়ে চল্‌ল। হাঁটু অবধি খদ্দর-পরা মুখে প্রশান্ত হাসি আমাদের প্রভাস মহারাজ—তার হাতে দড়ি না দিলেও চলত নিশিকান্ত। ইস্কুল-ঘর দখল করে নিয়ে পুলিশ ওখানে ঘাঁটি করেছিল। সামান্য এই পথটুকু নিয়ে আসার মধ্যে আসামী পালিয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পালাবার হলে অপেক্ষা করত কি সে বাড়ি বসে? কত জনে সে বুদ্ধি দিয়েছিল, সে যায় নি। ওরা এলে প্রভাস বেরিয়ে এসে হাত দু-খানা এগিয়েই দিল একরকম। হাতে হাতকড়ি পরাল, কোমরেও এই মোটা এক দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল। সোজাপথে না নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে ভদ্রার কূলে কূলে হাটখোলা অবধি তাকে নিয়ে বেড়াল। তার মানে, সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে নিক ওদের প্রতাপ। কাল হল এই প্রতাপ দেখাতে গিয়েই। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে মানুষ জমতে লাগল,—সকলের মুখে ঐ এক কথা। ভোরবেলা ওরা যে যার ঘরের মধ্যে ছিল, থানার লোক যেন ফাঁক বুঝে সেই সময় জুতো মেরেছে একা প্রভাসকে নয়—অঞ্চলসুদ্ধ মানুষের মুখে। প্রভাসকে এমনি ভালবাসত সবাই। বাসবে না কেন নিশিকান্ত, সর্বত্যাগী হয়ে কে এমন ভালবেসেছে দেশের মানুষদের? বারাণ্ডায় ঐ যে আধ-পোড়া শাল-খুঁটি, ঐখানে ঠিক-দুপুরে প্রভাসকে বসিয়ে রেখেছিল। মালসায় করে গুড়-মুড়ি খেতে দিয়েছে, তা সে খায় নি। প্রহরখানেক একটানা জেরা করে ক্লান্ত বৈদ্যনাথ সবেমাত্র খেতে গেছেন, খেয়ে দেয়ে এসে নব উদ্যমে আবার এক দফা চেষ্টা চলবে, তারপর পাঁচটার গাড়িতে সবসুদ্ধ আগরহাটি হয়ে সদরে রওনা হয়ে যাবেন, এই সাব্যস্ত আছে। কাণ্ডটা ঘটল এই সময়। আশপাশ আট-দশখানা গ্রামের বিস্তর লোক দলে দলে মিছিল করে এসে পড়ল। শত শত নিশান উড়ছে, গর্জমান জনতরঙ্গ অধীর হয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—

ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে নিশিকান্ত। খাওয়া হল না বৈদ্যনাথের—এঁটো-হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটলেন। হাটুরে মানুষও যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। প্রভাসের হাতকড়ি ভেঙে কোমরের দড়ি কেটে কাঁধে তুলে লাফাতে লাফাতে তারা নিয়ে গেল। জনতার নজর এড়িয়ে বৈদ্যনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এঁদোপুকুরে কচুবনের ভিতরে গিয়ে বসেছিলেন, চাঁদ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হয়েছিল নাকি তাঁকে। সত্যি, তাজ্জব ঘটে গেল নিশিকান্ত—এক মুহূর্ত আগে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। প্রভাসকে শুধু ছাড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—জমাদার-কনেস্টবল উর্দি-চাপরাস ফেলে 'বাপ' 'বাপ' বলে পালিয়েছে, তাদেরই ক'জনকে ধরে তালাবদ্ধ করে রাখল ঐ পাশের কামরায়। তে-রঙা নিশান পতপত করে উড়ছে ইস্কুলঘরের ছাতে। পাঁচ রাত চার দিন উড়েছিল ঐ ভাবে।

রাত্রি প্রহরখানেক অবধি এই সমস্ত চলল তো নিশিকান্ত, তারপর চারদিক স্তব্ধ হলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবছি, এ কি হয়ে গেল—ঠিক এমনটা চাই নি, আশাও করি নি এত সহজে এমন দখলে এসে যাবে সমস্ত। কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ি—সে ব্যাপারও এইরকমটা নাকি? হঠাৎ বিজয় হয়ে যায়, যত মানুষ মরবে আর যত গোলাগুলি চলবে বলে আস্ফালন করা হয় আসলে তার সিকির সিকিও লাগে না। এর পরবর্তী অধ্যায়ের আঁচ করছি, এ ব্যাপার অবশ্য এখানেই চুকবে না। আমরা—বয়স যাদের বেশি—সাব্যস্ত করতে পারি নে, কি করতে হবে অতঃপর আমাদের। কিন্তু জোয়ান ছেলেগুলো বেপরোয়া, তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, হাসি-স্ফূর্তির অবধি নেই—খবর নিয়ে আসে, শুধু এই একটা জায়গা নয়—সর্বত্র প্রায় এক অবস্থা। সাম্রাজ্যের হাজার ছিদ্র, সামলাবে ওরা আর ক'দিকে? কত মানুষ আছে শুনি, কত হাতিয়ার?

আর হাতিয়ার হাতে পেয়ে কে কোন্ দিকে তাক করবে, তারই বা ঠিক কি? ওদের নিজের ঘরের ছেলেরাই বিরক্ত হয়ে বেঁকে বসছে ক্রমে। সদর থেকে ফিরে এসে একজন গল্প করছে, সাদা সৈন্যের ব্যারাকের সামনে দিয়ে জনতা জকার দিতে দিতে যাচ্ছিল, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়। সৈন্যদেরই একজন নাকি দরজায় বেরিয়ে হাসিমুখে জবাব দিল, ফর গড্‌স্ সেক—ঈশ্বরের দোহাই, ভারত ছেড়ে দেশে ফিরতে দাও আমাদের। ছেলেগুলো মুখ নেড়ে নেড়ে আমাদেরই উপদেশ দিতে আসে, অত ভাবছেন কি দাদা? চালাও হুকুম এবার, নেতার মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পোস্ট-অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, খবরের কাগজ বন্ধ। ছেলেরা বলে, ভাল হয়েছে—বানানো গল্প আর সুকৌশলে পিছু-হঠার বাহাদুরি পড়তে হবে না এখন আর। কাগজ আসছে না, তা বলে খবরের প্রচার কিন্তু বন্ধ নেই। গাছে গাছে অলক্ষ্যে এঁটে দিয়ে যাচ্ছে সাইক্লোস্টাইল-করা খবর। হুলস্থুল কাণ্ড। বিদেশে ফৌজ গড়েছে আমাদের। আসছে, তারা এসে গেল বলে। পথ তৈরি কর তাদের জন্য।

রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে ফেলেছে, পগার কেটেছে দশ-বিশ হাত অন্তর। খেয়া-নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। ছোট রেললাইনও একেবারে বেমালুম মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ সাত জায়গায়। সদর থেকে সৈন্য নিয়ে আসা সহজ হবে না আর এখন। রোজই নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা দিন গুণছি নিশিকান্ত—খবর নিচ্ছি, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে কি আগুন? আগাপান্তলায় আগুন লেগে গেলে জল ঢালবে তখন কোন দিকে?

কিন্তু আটকানো গেল না নিশিকান্ত। রাস্তায় নূতন মাটি ফেলে গাছ সরিয়ে মেটে রঙের সারবন্দি ট্রাক এসে পড়ল, আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত্রি হেঁটে জন চারেক আমরা একবার রানায়ের মোহানা অবধি গিয়ে

পড়েছিলাম, কিন্তু দূরের জায়গায় বেশি বিপদ। সবদিকে ডামাডোল চলছে, অচেনা লোক দেখলে সবাই কেমন এক ভাবে তাকায়। মুশকিলের কথা বলব কি—সারাদিনের মধ্যে একমুঠো ভাত কি চিঁড়ে জোটাতে পারলাম না, সকলে চোখ কটমট করে চায়, অনেকে নূতন মানুষ দেখে সন্দেহ করেছে পুলিসের চর আমরা। কে পুলিস আর কে কর্মী আলাদা করার উপায় ছিল না, পুলিসই ভলান্টিয়ার সেজে খোঁজখবর নিত সময় সময়। অবস্থা দেখে আমাদের আতঙ্ক হল, দিনের বেলা এই রকম—রাত্রে নিশ্চয় ধরে পিটুনি দেবে। অথচ আত্মপরিচয় দিতেও ভরসা হয় না। যত ঢাকাঢাকি করছি, সন্দেহ ততই বেড়ে যাচ্ছে সকলের।

চুপি-চুপি বলি তা হলে নিশিকান্ত, জেলে গিয়ে যেন সোয়াস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম ছ-সাত মাসের পর। নিশ্চিন্ত। মাথা খারাপ হল শুনে তোমরা হায়-হায় করতে, আমার তার জন্য কিন্তু এতটুকু কষ্ট ছিল না। এক বিচিত্র অনুভূতি স্বপ্নের মতো এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মোটা মোটা গরাদে আর উঁচু পাঁচিলে যেন লোহার কেল্লা গড়ে রাজাধিরাজ হয়ে নিশঃঙ্কে ছিলাম। পথের কুকুরের মতো আর তাড়া খেয়ে ঘুরতে হত না।

প্রভাসকে শেষ দেখেছিলাম গরাদের ফাঁক দিয়ে। সে দেখে নি, অঘোরে ঘুমুচ্ছিল তখন। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে সেলের ভিতরটা অবারিত। ওয়ার্ডার পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে। ফাঁসি-কাঠে কালো বার্নিশ লাগিয়েছে, চর্বি দিয়ে মেজেছে। প্রভাসেরই ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে সকালবেলা। তারা তৈরি।

ঘুমুচ্ছিল, রাতের স্তব্ধতা চূর্ণিত করে ঘণ্টার আওয়াজ এল। শোনা কথা অবশ্য—ধড়মড়িয়ে উঠে সে বলছিল, স্নান করব, পুণ্যকর্মে যাচ্ছি, শুচি-স্নাত হয়ে যেতে চাই।

উদাত্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, শেষ-রাত্রের নির্মল আকাশে অজস্র হীরার কুচির মতো তারা দপদপ করছে—সেই সময় ঘুম ভেঙে উঠে বসে শুনতে পাচ্ছি, যার কাছে যে দোষ করেছি, মাপ চেয়ে যাচ্ছি ভাই। শুনতে পাও বা না পাও, আমায় মাপ কোরো তোমরা—

চোখে দেখি নি, কিন্তু ছবিটা আন্দাজ করতে পারি নিশিকান্ত। পবিত্র আগুনের মতো প্রদীপ্ত মুখ, ফাঁসির মঞ্চে অচঞ্চল উঠে দাঁড়াল আমাদের প্রভাস মহারাজ।

যে সময় বিচার চলছিল, একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মারতে পার তুমি? সত্যি কি মেরেছিলে?

খানিক হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে সে বলছিল, মানুষ কি মারা যায়? জানোয়ার মরেছিল কি-না খবর রাখি নে। তারপর একটু স্তব্ধ থেকে বলল, একটা কাজ কোরো ভাই দয়া করে। মহাত্মাজী বেরিয়ে এলে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ কর মহাত্মাজী।

তুমি সেই ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছ, যেখানে দীনতম ব্যক্তিও উপলব্ধি করবে এ তারই দেশ; দেশের পরিগঠনে তাদের মতামতও কার্যকর হবে। সেই ভারতে উচ্চ-নীচ সমাজ-বিভেদ থাকবে না, সর্বসম্প্রদায় পরস্পর প্রীতিমান হয়ে বাস করবে। অস্পৃশ্যতা থাকবে না, মাদক-সেবন থাকবে না, নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে। তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষের এই ছবি এঁকে দিয়েছ আমাদের মনে।

এই সভাক্ষেত্র শেষ নয় জয়রামপুরের। দুর্গম পথ এবার। ঐ নাবাল বিলের প্রান্তে চাষীদের বসতি—প্রায় আড়াই শ' ঘর হবে। তাদের কেউ এখনো সভায় আসে নি। তাকিয়ে দেখ নিশিকান্ত, রুক্ষ বিল নবাঙ্কুরে

হরিৎশ্রী ধারণ করেছে। সারবন্দী চাষীরা ক্ষেত নিড়াচ্ছে এই পড়ন্ত বেলাতেও। ক্ষেতে বড় গোন। টিলার উপর বাঁশ ফাড়ছে ফটফট আওয়াজে—জাঙালের দু-ধার ঘিরে দেবে, গরুতে মুখ বাড়িয়ে যাতে ধানচারা না খেতে পারে। দেখ, চেঁচোঘাসের বোঝা এনে এনে জাঙালে ফেলছে—বাড়ি ফিরবার সময় নিয়ে যাবে, রাত্রে কুঁড়োর সঙ্গে মেখে জাবনা হবে গরু-বাছুরের। ঘাড় উঁচু করে একবার ওরা তাকিয়েও দেখছে না এদিককার এ উৎসবের আয়োজন। ইতিহাসের এমন একটা স্মরণীয় দিন—তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারো।

রাগ কোরো না, ওরা খবর পায় নি। খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে যে স্বাধীনতা এসে গেল—আর ছাপার অক্ষরে দিনের পর দিন মিথ্যা কথাই বা লিখবে কেন? কিন্তু আমাদের জয়রামপুর অবধি এসে পৌছবার দেরি আছে। বিয়াল্লিশ সনে লাইন উপড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে রেলগাড়ি চলে না। ভদ্রা মজে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে একটা ছোট্ট ডিঙি আনতে গেলেও কলমির দামের ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে অনেক কষ্টে নিয়ে আসতে হয়। দিল্লি-করাচির স্বাধীনতা চট করে কি পৌছতে পারে এতদুর?

প্রফুল্লদের গাফিলতি নেই। হাটে দু-হপ্তা ধরে কাড়া দিচ্ছে। তোমাদের সকলের নাম দিয়ে হাণ্ডবিল বিলি করছে—পতাকা উত্তোলন হবে, মস্ত বড় সভা হবে, শহীদ-বেদিতে পুষ্পাঞ্জলি ও শহীদ-পদক দেওয়া হবে, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। এসব সত্ত্বেও খবর পায় নি ওরা। যেমন গ্রাম-গ্রামান্তে বিনা তারে খবর হয়েছিল দূর-অতীতে নীল-বিদ্রোহের দিনে, কিম্বা এই সে দিন লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগষ্ট-বিপ্লবের সময়।

ওদের কাছে খবর পৌছবার উপায় কর নিশিকান্ত। প্রফুল্লদের সাধ্য নেই। কালোয়া সাদার আসনে বসেছে, সেই আনন্দে মশগুল; হুকুম-

হাকাম চালাচ্ছে, যতদূর পারছে পকেট ভরে নিচ্ছে। এই অবধি পারে প্রফুল্লরা। অনেক সাধনায় বক্তৃতামঞ্চের উপর মনের হাসি গোপন করে অশ্রু নিঃসরণের কায়দাটা শিখেছে। কর্তৃত্বের সকল কারচুপি নখমুকুরে। আজ ইংরেজ গবর্নমেণ্ট—সেলাম, আমরা সঙ্গে আছি স্যর। এসেছে স্বরাজ—জয় হিন্দ, এই যে হাজির আমরা।

ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির দুর্গে বসবাস করে নির্বিঘ্ন মনে করছে নিজেদের। স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, চাষীপাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে আর এক রকম হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল-বৈদ্যনাথের তদ্বিরে সভার জায়গা শেষ অবধি নিশ্চয় ভরে যাবে নিশিকান্ত—বুড়োরা আসবে, আমাদের পাড়ার দিককার অনেকে আসবে, কিন্তু ঐ ছোকরাদের আসবে না প্রায় কেউ। একালের ওরা মাথা নিচু করে বেড়ায় না আর ভক্তিমান ভাবে, জুতো খেয়ে পিঠের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চোখের জল ফেলে না। কারুরও দয়ার প্রত্যাশী নয় ওরা। কেমন করে লোভ ঢুকে পড়েছে মনে—প্রফুল্লদের মতো দালান-কোঠায় শোবে, এলাক-পোশাক হবে ঐ রকম। কালীতলায় ঢাক বাজে না আগেকার মতো, ঢাকের তালে নেচে মাটিতে লুটায় না ভক্তের দল। পূজোর কাছে ওদের বেশি আনাগোনা দেখা যায় পাঁঠাবলির সময়টা। অবিশ্বাসী ওরা—বুড়োরা বলে নরকেও জায়গা হবে না। বলিপর্ব শেষ হতে না হতে ছাল ছাড়াতে লেগে যায়, অগৌণে মহাপ্রসাদের মাংস পেঁয়াজ-রসুন সহযোগে চাপিয়ে দেয় উনুনের উপর। পুরুত বিষ্ণু চক্রবর্তী অভিসম্পাত করেন এই নাস্তিক্যের জন্য। ওরা হাসে। চাষীপাড়ার পৌরোহিত্য ছেড়ে দেবেন বলে তিনি শাসিয়েছেন অনেকবার, এরা পদানত হয় নি। অবশেষে অনেক বিবেচনা করে পুরুতঠাকুরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমা করেছেন।

ঘন গিরাওয়ালা বাঁশের লাঠি কেটেছে ওরা, বেতের ঢাল বানিয়েছে। যখন স্বাধীন দেশের সৈন্য নেওয়া হবে—ওদের পাড়ায় তখন লোক পাঠিও, সৈন্যদল আধাআধি তৈরি হয়ে আছে ওখানে। ও-পাড়ার শিশুরা সকালে নারিকেল-গামড়ার গরু বানিয়ে খেলা করত, এখন খেজুর-ডালের গোড়া চেঁচে-ছুলে নিয়ে বন্দুক বন্দুক খেলে। কি করে বলতে পারি না—জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর নানা দেশের অনেক গুহ্য খবর, প্রফুল্লরা কিছুতে যা ফাঁস করতে চায় না। নিজেদের আর অসহায় দুর্বল মনে করে না ওরা কেউ। ঐ যে শত শত বাঁশের ঘর, কঞ্চির বেড়া—বাঁশের কেল্লা ওগুলো, রামজয় ঠাকুরের একটার জায়গায় দেশব্যাপী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ—